মুর্শিদাবাদের ইতিহাস

প্রতিভা রঞ্জন মৈত্র

গননির্দ্দেশ পুস্তকালয়
মু র্শি দা বা দ

—পরিবেশক—

দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

MURSHIDABADER ITIHAS
(History of Murshidabad)
Historic Essay by Prativa Ranjan Maitra

প্রথম প্রকাশ :

১লা জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :

অরুণ ভট্টাচার্য্য
গননির্দ্দেশ পুস্তকালয়
পো: ও জেলা মুর্শিদাবাদ

মুদ্রক :

এসেম্বলী অফ গড চার্চ্চ স্কুল
১৮, রয়েড স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র :

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

আলোক চিত্র :

বাদল সরকার
দীপক দে

মূল্য : আট টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউ
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

সূচীপত্র

মুর্শিদাবাদ	...	১
মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	...	৯
মসনদের কথা	...	১৮
নিজামত বৃত্তি ও নিজামত তহবিল	...	৮৬
বড়নগর	...	১০৩
কর্ণসুবর্ণ	...	১১১

গ্রন্থকারের নিবেদন

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নিয়ে ইতিপূর্ব্বেও লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যিনিই লিখুন তাঁকে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণীর ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। দুঃখের হলেও একথা সত্য যে মাত্র দু'শো বছর আগের ইতিহাস আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। নানা ঘটনা প্রবাহর মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের উত্থান পতন! সেই সব ঘটনাপ্রবাহও নানারকম গল্প-কাহিনীতে আচ্ছন্ন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনায় ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনায় এবং কুশীলবদের চরিত্রচিত্রনে কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়। একের সঙ্গে অপরের রচনার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে পাঠক সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরকালের ইতিহাস-কারও হন্ চিন্তিত। এক্ষেত্রে অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। কারণ ইতিহাস তথ্যনির্ভর হওয়া চাই এবং ইতিহাসের গবেষণার মূল লক্ষ্য—সত্যানুসন্ধান। আনন্দের কথা—ইতিমধ্যেই এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু

হয়েছে এবং গবেষণা সম্পূর্ণ হলে হয়তো মুর্শিদাবাদের তথা বাংলায় অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যা আজও আছে অন্ধকারে তা আগামী দিনে হয়ে উঠবে আলোকিত। আমরা সেইদিনের অপেক্ষায় থাকবো।

বাংলা নাটক এবং উপন্যাসে কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঘটনাপ্রবাহ সাজিয়ে নিচ্ছেন অথবা চরিত্রচিত্রন করছেন। কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত নাটকে বা উপন্যাসে ইতিহাসের বিকৃতি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—আঠারো শতকের বাংলার ইতিহাস। রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবকাল ছিল প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ। পলাশীযুদ্ধের পর থেকেই সেই গৌরব হতে থাকে অস্তমিত। ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থানের পর থেকেই মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমে কলকাতার গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

সমসাময়িক ইতিহাস এবং পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া কিছু পুরণো পত্র পত্রিকা, চিঠিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ থেকেও কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছি। কোন চরিত্রের প্রতি যদি কোন কটাক্ষ থেকে থাকে তবে তার জন্য দায়ী—ইতিহাস।

প্রকাশকবন্ধু অরুন ভট্টাচার্য্যর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা করতে চাই না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের (কলিকাতা) কিউরেটর শ্রদ্ধেয় শ্রীনিশীথ রঞ্জন রায় মহোদয় আমাকে কয়েকটি ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই বই পড়ে পাঠকদের যদি ভালো লাগে এবং মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের বিষয়ে অন্ততঃ কিছুটা ঔৎসুক্য জাগায় তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো॥

"The history of Murshidabad city
is the history of Bengal during
the eighteenth century."

লেখকের পরবর্ত্তী বই—

নবাব-বেগম-উজির

কাটরা মসজিদ

জাহান

হাজার দুয়ারী

দুর্গা
টেরাকো
ভটবাটির
মন্দির
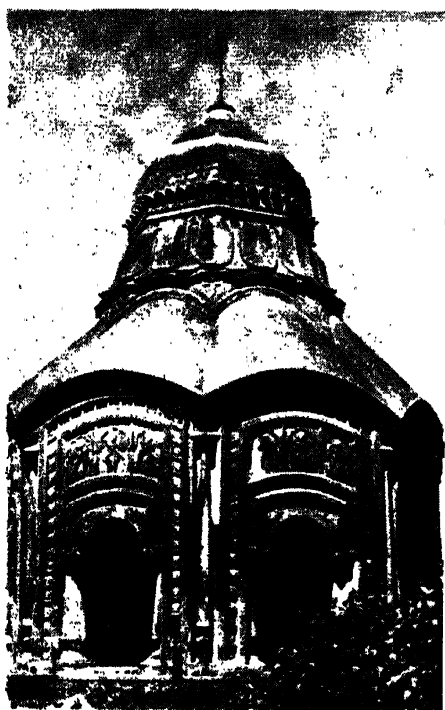
ভবানীশ্বর মন্দির
বড় নগর
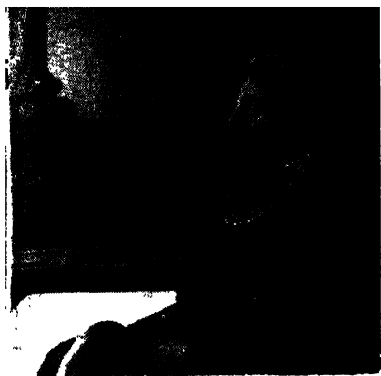
মুর্শিদকুলী খাঁ

সিরাজদ্দৌলা

মীরজাফর ও মীরণ

মীরকাশেম

রাজা রাজবল্লভ

রেজাখান

বামদিক থেকে ঃ— ১ম সারি—মুর্শিদকুলী খাঁ, সিরাজদ্দৌলা।

১ম ও ২য় সারি—টেরাকোটা অলঙ্করন—চারবাংলা মন্দির
বড়নগর. মুর্শিদাবাদ
৩য় সারি—জয়দুর্গা মূর্তি· বড়নগর. ভট্টবাটির মন্দির.
পঞ্চমুণ্ডী শিব—বড়নগর, ডাচ্ সমাধি—কাশিমবাজার
৪র্থ সারি—একটি পুরণো মন্দিরের একাংশ—বড়নগর.
বাচ্চাওয়ালী তোপ—কেল্লা নিজামত, চকমসজিদ।

মুর্শিদাবাদ

"একটি প্রাচীন রাজধানী"

বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। অষ্টাদশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পীঠস্থান। পাশাপাশি দেখা গেছে জ্বলন্ত দেশপ্রেম আর ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা। নবাব আলীবর্দ্দি-সিরাজদ্দৌলা-মীরজাফর-মীরকাশেমের স্মৃতি বিজড়িত সেই মুর্শিদাবাদ। বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী।

নবাবী আমলের রাজধানী মুর্শিদাবাদের আড়ম্বর আর জাঁকজমকের কথা লেখা আছে ইতিহাসে। আয়তনে, জনসংখ্যায় এবং ঐশ্বর্য্যে সেকালের মুর্শিদাবাদ ছিল লণ্ডনের চেয়েও বড়। পলাশী যুদ্ধের পর স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ বলেছে—"The city of Murshidabad is as extensive, populous and rich as the city of London with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city''.

আঠারো শতকে রাজধানী মুর্শিদাবাদের এলাকা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোসবাগ থেকে বড়নগর, আর পূর্ব্ব তীরে মতিঝিল থেকে মহিমাপুর পর্য্যন্ত। এই বিশাল নগরী জুড়ে ছিল অসংখ্য প্রাসাদ, অট্টালিকা আর রমণীয় উদ্যান। কুলুরীতে মুর্শিদকুলীর প্রাসাদ, চকবাজারে বিশাল দরবারগৃহ—'চেহেল সেতুন', আলীবর্দ্দির প্রাসাদ, সিরাজের মনসুরগঞ্জ প্যালেস (হীরাঝিল প্যালেস), ঘসেটির মতিঝিল

প্রাসাদ—নাম সিংহদালান, মহিমাপুরে জগৎশেঠের ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ ছাড়াও ছিল আমীর ওমরাহদের সুরম্য অট্টালিকা। হীরাঝিলের এক মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই ছিল মোরাদবাগ প্যালেস, যেখানে ইংরেজ রেসিডেন্ট অনেকেই বাস করতো। * ছিল লালবাগ প্যালেস, যেখানে বাদশাহ হওয়ার আগে বহুদিন বাস করেছে ফাররুখসের। † বড়নগরে ছিল রানীভবাণীর প্রাসাদ, হীরাঝিলের দক্ষিণে ছিল রায়দুর্লভের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ডাহাপাড়া আর ভট্টবাটিতে ছিল বঙ্গাধিকারীদের রাজবাড়ী। পিলখানায় ছিল নবাব নাজিমদের হাতীশালা। হুমায়ুন মঞ্জিলে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট হাউস বা বিচারালয়। এ সব ছাড়াও ছিল রোশনীবাগ, ফর্হাবাগ।

কিন্তু সে প্রাচীন বনেদী গৌরবের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই আজ। আজকের মুর্শিদাবাদ যেন অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসের 'ফসিল'। পুরনো অনেক স্মৃতিচিহ্নই আজ ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন। সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও আজ অযত্ন আর অবহেলায় জাদুঘরের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান অবিন্যস্ত দরিদ্ররূপ ইতিহাসের বাতাবরণে তো বটেই এমন কি আজকের দর্শকের চোখেও করুণার উদ্রেক করে।

অষ্টাদশ শতকের আগে এই শহরের নাম ছিল-'মুকসুদাবাদ'। কেউ কেউ বলেছে—মুখসুসাবাদ। এই নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর আছে।

প্রবাদ আছে—বাদশাহ হোসেন শাহর সময় মুখসুদন দাস নামে এক নানকপন্থী সন্ন্যাসী বাদশাহর রোগ নিরাময় করে এ স্থানটি

* রেনেলের মানচিত্রে মোরাদবাগ প্যালেসের উল্লেখ আছে। এখানে লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং ভ্যান্সিট্টার্ট সায়েব বাস করেছে।

† ১৭০৭ থেকে ১৭১২ সাল পর্য্যন্ত লালবাগ প্রাসাদে বাস করেছে ফাররুখসের।

নোখেরাজ' স্বরূপ পেয়েছিলো। পরে তার নামানুসারেই এর নাম হয়—মুখস্সুদাবাদ। কেউ কেউ বলেছে—মুখস্সুদ খাঁ থেকে এর নাম মুখস্সুদাবাদ। রিয়াজুস সালাতীন এর মতে—মুখস্সুস খাঁ নামে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর নামানুসারে 'মুখস্সুদাবাদ' নামের উৎপত্তি।

আইন-ই-আকবরীতে আছে—মুখস্সুসাবাদের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার শাসনকর্ত্তা সায়েদ খাঁর ভাই মুখস্সুস খাঁ। রিয়াজুস সালাতীন এবং আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত মুখস্সুস খাঁ একই ব্যক্তি কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। পুরনো কাগজপত্রে মুখস্সুদাবাদ এবং মুখস্সুসাবাদ—এই দুটি নামই পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অথবা ষষ্ঠদশ শতকের রচনা 'ভবিষ্যৎ পুরাণ'-এ, এই শহরকে মোরাস্সুদাবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এর প্রতিষ্ঠাতা একজন যবন (মুসলমান)। সায়র-উল-মুতক্ষরীণ এর অনু-বাদক রেমণ্ড সায়েবের মতে—এই স্থানের নাম প্রথমে ছিল কোলারিয়া (Colaria), পরে হয় ম্যাক্সুদাবাদ (Macsoodabad) এবং তারও পরে হয় মুরস্সুদাবাদ (Moorsoodabad)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শহরের পূর্ব্বে কুলুরী নামে একটি মৌজা আছে এবং এই স্থানেই মুর্শিদকুলী খাঁ বাস করতো।

১৬৬৬ সালে এই স্থান পরিদর্শন করে ফরাসী পর্য্যটক তাভেরনিয়ে (Travernier), এই বিরাট শহরের নাম Mada-soubazarki' বলে উল্লেখ করেছে।

টিফেনথেলারের মতে আকবর বাদশাহ, এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শহরের পূর্ব্বদিকে আকবরপুর নামে একটা মৌজা ও গ্রাম আছে।

তবে যাই হোক, মুর্শিদকুলী খাঁ তার দেওয়ানী দপ্তর ঢাকা থেকে পুরনো মুখস্সু'দাবাদ বা মুখস্সুসাবাদ-এ স্থানান্তরিত করার পর নবাবের

নামানুসারে এই শহরের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। সেটা ১৭০৪ সাল। ১৭০৪ সনে তৈরী মুদ্রায় সর্ব্বশেষ মুখসুসাবাদ নাম দেখা যায় এবং ১৭০৫ সনে স্থানীয় টাকশালে তৈরী মুদ্রায় সর্ব্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ নাম পাওয়া যায়।*

দেওয়ানীর সদর দপ্তর তথা রাজধানীরূপে মুর্শিদাবাদকে নির্ব্বাচিত করার পেছনে ছিল মুর্শিদকুলী খাঁর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা। উইলিয়ম হান্টার বলেছে—"It seems probable that Murshid Kuli Khan was induced to take this step by political considerations.........."the bank of Bhagirathi afforded a more central position for the management of the three provinces of Bengal, Bihar and Orissa. The new city also was situated on the line of trade..."

রিয়াজুস সালাতীনের মতে—"An excellent site where news of all four quarters of the Subah could be easily procurable and which like the pupil of the eye was situated in the centre of the important places of the Subah."

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে মুর্শিদাবাদ মূলতঃ রেশম শিল্পের জন্যই বিখ্যাত ছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই শহর মুঘল কর্ম্মচারীদের আবাসস্থল হয়ে খ্যাতি লাভ করে।

সপ্তদশ শতকে কাশিমবাজারে ছিল ফরাসীদের কারখানা। ১৬৬৫ সালে সম্রাট আওরংজেব প্রদত্ত ফরমান বলে একদল আর্ম্মেনিয়ান সৈদাবাদে বসবাস শুরু করে। ডাচ্‌রাও তৈরী করে তাদের নিজস্ব কারখানা কালিকাপুরে। উদ্দেশ্য সবারই এক—রেশমের ব্যবসা।

* Notes on Gour and other Historical Places--by Monomohan Chakravarty.

বার্ণার বলেছে যে—ডাচদের কারখানায় কাজ করতো আটশোজন দেশীয় শ্রমিক, সেই তুলনায় ইংরেজ বা অন্যান্যদের কারখানায় দেশীয় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল নগন্য।

নবাবী আমলে বাংলার রেশম ছিল খুবই উন্নত। রেশমের উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম কাপড়ের কদরও ছিল বেশী। বাংলাদেশে সে সময় নানা ধরণের মসলিন কাপড় তৈরী হতো। শ্রেষ্ঠ মসলিনের নাম ছিল—'আভরণ'। তখনকার দিনে একখানা আভরণের দাম ছিল চারশো টাকা। ওজন ছিল মাত্র পাঁচ ভরি। প্রধানতঃ নবাব-বাদশাহরাই এই কাপড় ব্যবহার করতো। শোনা যায়—একসময় সম্রাট আওরংজেবের কন্যা মসলিন কাপড় পরে সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম কাপড়ের আড়ালে তার রোমাবলী দেখে সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে কন্যাকে 'বেশরম্' বলে ভর্ৎসনা করে। উত্তরে সম্রাট কন্যা জানায় যে—সাতখানা কাপড় দিয়ে তার শরীর ঢাকা আছে।

সে সময় মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের বিদেশে কতো কদর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ট্যাভেরনার প্রদত্ত বিবরণে। তার বক্তব্য—কাশিমবাজার থেকে বছরে বাইশ হাজার গাঁট (এক গাঁট = একশো পাউণ্ড) রেশমের কাপড় বিদেশে রপ্তানী করা হতো।

রেশম, তুলো আর হাতীর দাঁতের তৈরী বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য সেকালে মুর্শিদাবাদ সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিল জন কেন্। সহকারী ছিল কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক। ১৬৮০ সালে জব চার্ণক প্রধান অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়।

মুর্শিদাবাদে ছিল সরকারী টাকশাল। নবাবী আমলের টাকশাল প্রথম তৈরী হয় ১৭০৫ সালে কেল্লা নিজামতের কাছে। পরে ১৭১৭ সালে নতুন করে টাকশাল তৈরী হয় মহিমাপুরে—জগৎশেঠের পুরনো

বাড়ীর সামনে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধেও মুখসুদাবাদে টাকশাল ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।*

১৭৬০ সালে মীরকাশেম মসনদে বসার পরই কলকাতা টাকশালের উন্নতি ঘটে। প্রধানতঃ এই সময় থেকেই মুর্শিদাবাদ টাকশালের গুরুত্ব কমে যায়। ১৭৭৭ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের অনুরোধে নবাব মোবারকদ্দৌলার আদেশে মুর্শিদাবাদ টাকশাল বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৮৫ সালে মাত্র কিছুদিনের জন্য একে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৭৯৬ সালে সরকারী আদেশ বলে সমস্ত প্রাদেশিক টাকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৯৯ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে টাকশালের যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাঠানো হয় কলকাতায় এবং টাকশালের বাড়ীটা বিক্রি করা হয় প্রকাশ্য নীলামে।

১৮০২ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় মুর্শিদাবাদের লোক সংখ্যা ছিল দেড়লক্ষ। পাঁচজন বেহারার পালকির একদিনের ভাড়া ছিল এক টাকা। কলকাতা থেকে আড়াই তোলা চিঠি মুর্শিদাবাদে পাঠাতে খরচ হতো ছ' আনা।

১৭২৯ সালে অতি মিহি বাঁশফুল চাল এক টাকায় পাওয়া যেত একমণ দশ সের। তিন মণ গমের দাম এক টাকা। টাকায় সাড়ে দশ সের গাওয়া ঘি। ১৭৭৬ সালে মিহি সর্ব্বোৎকৃষ্ট চালের দাম ছিল টাকা প্রতি ষোল সের। ১৮২২ সালে এক মণ ভাল চাল পাওয়া যেত তিন টাকায়। সাতাশ টাকায় এক মণ গাওয়া ঘি। এই সময় একটা ইলিশ মাছের দাম ছিল এক পয়সা।

বর্গীর প্রচণ্ড হাঙ্গামার পরও মুর্শিদাবাদের জৌলুষ ছিল অম্লান, সম্পদ ছিল অফুরন্ত। তারপর ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের পর থেকেই

* "A rupee of Aurangzeb preserved in Lahore Museum shows that Mukhshudabad was a mint town as early in 1679 AD."
—District gazetteer MURSHIDABAD, edited by L. S. S. O'Malley, 1914.

খর্ব্ব হতে শুরু করে মুর্শিদাবাদের গৌরব। একটি একটি করে সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত হলো কলকাতায়। শেষটুকু সমাধা করে দিয়েছে লর্ড কর্ণওয়ালিশ। ১৭৯৩ সালে। এই সময়েই ফৌজদারীর সদর দপ্তর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। শুরু হয়-কলকাতার উন্নতি ; মুর্শিদাবাদের অবনতি। কলকাতা উঠেছে। মুর্শিদাবাদ ডুবেছে। কলকাতা গড়েছে। মুর্শিদাবাদ ভেঙ্গেছে।

ভাগ্যলক্ষী এসেছিলো। চলেও গিয়েছে এক সময়। ধরে রাখতে পারেনি মুর্শিদাবাদ।

অতীত গৌরব আজ যেন শুধুই রূপকথা। নবাব নাজিমদের জৌলুষ, আড়ম্বর আর বিলাসিতার কথা আজ যেন শুধুই গল্প।

আজকের মুর্শিদাবাদে অবশিষ্ট আছে অতীতের কয়েকটি মলিন স্মৃতি আর ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ। অথচ, কতো প্রাচীন ঐ গৌড়। এখনো সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে তার কঙ্কাল। কিন্তু ক্ষয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ। প্রাচীন গৌরব আর জৌলুষ সবই আজ মহাকালের গর্ভে।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মুর্শিদকুলীর প্রাসাদ আর 'চেহেল সেতুন'। মুছে গেছে ফর্হাবাগ আর রোশনীবাগের সৌন্দর্য। সিরাজের সাধের হীরাঝিল প্রাসাদ—ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন। মোরাদবাগ আর লালবাগ প্যালেসের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে আজ বিলুপ্ত। ঘসেটি আর নওয়াজেসের মতিঝিল প্রাসাদ তলিয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে। তাপদগ্ধ ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘু ডাকে জগৎশেঠের পুরনো ভিটেয়।

অথচ মুর্শিদাবাদের প্রতিটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ইতিহাস। ছড়িয়ে আছে অনেক পুরনো স্মৃতি। কোনটা জানা কোনটা বা অজানা।

আজও মাঝে মধ্যে কোন কোন পুরনো ভিটে অথবা জমির নীচে

হঠাৎই পাওয়া যায় পুরনো আমলের বাদশাহী মোহর অথবা প্রাচীন কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি। অনুসন্ধিৎসুরা জানতে চেষ্টা করে সে জায়গার ইতিহাস। শুরু হয় প্রত্নতাত্বিক তর্কবিতর্ক।

আজকের মুর্শিদাবাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মৃত প্রায়। সম্ভবতঃ অভিশপ্তও। তবু আজও পর্য্যটক আর অনুসন্ধিৎসুদের কাছে মুর্শিদাবাদের আকর্ষণ কম নয়।

আজকের পর্যটক মুর্শিদাবাদে এসে অনেক উৎসাহ আর কৌতূহল নিয়ে জানতে চায় মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। বর্ত্তমানের আয়নায় দেখতে চেষ্টা করে অতীতকে। ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে শুনতে পায় অতীতের দীর্ঘশ্বাস। শুনতে পায় ইতিহাসের বোবাকান্না।

তাই আজও আছে মুর্শিদাবাদ। আছে তার ইতিহাস ॥
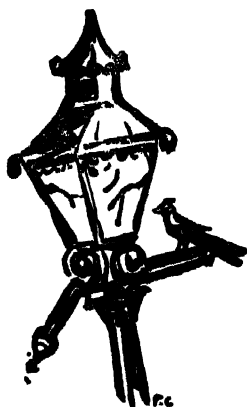
মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি

হিন্দু, বৌদ্ধ, মোগল ও ইংরেজ রাজত্বের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য মুর্শিদাবাদের নানাবিধ পুরনো স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তান্ত্রিক, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু চিহ্ন মুর্শিদাবাদে আজও বর্ত্তমান। হিন্দু রাজাদের স্মৃতি, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্ঘারাম, বুদ্ধমূর্ত্তি, তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি তারই প্রমাণ।

মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ভাগীরথীর গতি ও অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

অনেকের ধারণা, বর্ত্তমান ভাগীরথী, গঙ্গার একটা শাখা মাত্র। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বর্ত্তমান ভাগীরথীই গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল। পরবর্ত্তীকালে ঐ প্রবাহ পূর্ব্বদিকে সরে গিয়ে, পদ্মাকে মূল প্রবাহ করে তোলে। গঙ্গা এবং পদ্মা সম্পূর্ণ পৃথক। দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তার উল্লেখ আছে। পূজো-পার্ব্বনে আজও এই ভাগীরথীর জলই গঙ্গাজল রূপে স্বীকৃত ও আদৃত হয়। পদ্মার জল নয়।

হাণ্টার সায়েব বলেছে—"There can hardly be a doubt that the present Bhagirathi represents the old channel of the Ganges by which the greater part of the waters

of the sacred river were formally brought down to the sea. The most ancient tradition, the traces of ruined cities, and the indelible record of names, all lead to this conclusion.'*

ইংরেজরা এই ভাগীরথীকেই কাশিমবাজার নদী ও হুগলী নদী নাম দিয়েছিলো। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী তৎকালীন দুটি প্রধান বন্দর—কাশিমবাজার ও হুগলীর নাম অনুসারেই নদীর ঐ নামকরণ করা হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কিছু কিছু প্রাচীন স্থান বা জনপদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বতীরে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটায় তেমন কোন পুরনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ছড়িয়ে আছে প্রাচীন যুগের বহু প্রত্ন-সম্ভার। মোটামুটিভাবে এই জেলাকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে—রঘুনাথগঞ্জ থেকে শুরু করে নদীয়া ও বর্দ্ধমানের সীমান্ত গ্রাম সালার পর্য্যন্ত ধরা যেতে পারে। পাঁচথুপী ও রাঙামাটি এই ভাগের অন্তর্গত। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় পাল-সেন যুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ এবং গুপ্ত পরবর্ত্তী যুগের প্রত্ন উপকরণে সমৃদ্ধ বলে ধারণা করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে রাজমহলের কাছ থেকে জঙ্গীপুর পর্য্যন্ত এলাকায় প্রধাণতঃ প্রাক সপ্তদশ শতকের মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তৃতীয় ভাগে লালগোলা থেকে বহরমপুর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর-বর্ত্তী এলাকায় নবাবী আমলের স্মৃতিচিহ্নগুলো ছড়িয়ে আছে।

সাধারণভাবে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী অঞ্চলকে 'রাঢ়' বলা হয় এবং পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী অঞ্চলকে বলা হয় 'বাগড়ী'। মুর্শিদাবাদ

* Statistical Accounts of Bengal, Vol. IX,—Hunter.

জেলার সমগ্র কান্দী মহকুমা, বহরমপুর সদর ও লালবাগ মহকুমার কিছু অংশ এবং জঙ্গীপুর মহকুমার অধিকাংশ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। বাকী অংশ (ভাগরথীর পূর্ব্ব তীরে) বাগড়ী নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলই প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। এই অঞ্চল থেকেই এযাবৎ পাল ও সেন যুগের বহু মূল্যবান প্রত্ন উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। কোন কোন প্রাপ্ত উপকরণ আরও প্রাচীন আমলের বলে গবেষকরা মনে করে। গুপ্ত যুগের একাধিক মুদ্রাও এতদঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের উপরিলিখিত রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। এমন কি এতদঞ্চলের ভাষাতেও কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

মুর্শিদাবাদের পীঠস্থান—কিরীটেশ্বরী। প্রাচীন নাম—কিরীট কণা। শাস্ত্রমতে—সতীদেবীর কিরীট এখানেই পড়েছিলো। মহা-নীলতন্ত্রে কিরীটেশ্বরীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন কালে এখানে সাধু সন্তরা সাধনা করতে আসতেন। অনুমান—শঙ্করাচার্য্যের সময় থেকেই কিরীটেশ্বরীর নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে। এখানকার মন্দিরে পূর্ব্বে যে ভৈরব মূর্ত্তি ছিল, সেটি প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি।

কর্ণসুবর্ণ (প্রাক্তন চিরুটি) রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে, রাঙামাটি, মুর্শিদাবাদের অপর একটি প্রাচীন স্থান। এখানকার মাটির রং ঈষৎ লাল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে, ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন রাজ্যে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ছিল ৪৪৫০ লী অর্থাৎ ৮৯০ মাইল এবং রাজধানীর পরিধি ছিল ২০ লী অর্থাৎ চার মাইল। এর মধ্যে হিউয়েন সাং দশটি বৌদ্ধ বিহার এবং দু হাজার বৌদ্ধ শ্রমন দেখেছিলেন। এখানে সে সময় বেশ কিছু সংখ্যক মন্দিরও ছিল। অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর দাতাকর্ণর পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষ্যে যেখানে সুবর্ণবৃষ্টি করা হয়েছিল সেই স্থানের নাম-কর্ণসুবর্ণ—এরকম

প্রবাদ আছে। হিউয়েন সাং তাঁর বৃত্তান্তে, রাজধানীর পাশেই, লো-টো-মো-চী (রক্ত মৃত্তি) নামে একটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। লো-টো-মো-চী, রাঙামাটি কি না এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এখন সবাই মেনে নিয়েছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই হিউয়েন সাং বর্ণিত লো-টো-মো-চী, যে বর্ত্তমান রাঙামাটি এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এখানে সম্রাট অশোকের সময় নির্ম্মিত কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এখানে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন।

রাঙ্গামাটিকে কেউ কেউ বলেছে—'কান সোনা'। লেয়ার্ড সায়েব বলেছে—'কান সোনাপুরী'। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে স্থানীয় কর্ণস্বর্ণ নামে এক সমাজের উল্লেখ আছে। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত বংশীয় এবং বৌদ্ধদ্বেষী। কিন্তু রাজ্যের জনসাধারণ ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। রাঙামাটি থেকে গুপ্ত যুগের একাধিক মুদ্রা, পাথরের ফলক, দেবদেবীর মূর্ত্তি, পোড়ামাটির শীলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে।

মহীপাল গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন স্মৃতি। মহীপাল ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ইঁট, মৃৎপাত্রের টুকরো ও ভগ্নস্তূপ নিঃসন্দেহে প্রাচীন জনপদের সাক্ষ্য। পালবংশীয় উত্তর রাঢ়াধিপ মহীপাল এর নামানুসারে নগরীর নাম ছিল মহীপাল। এখানেই ছিলো পালরাজাদের রাজধানী। এখান থেকে বিভিন্ন সময়ে অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড এই অঞ্চল থেকে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামে পাঠিয়েছিলো। অদূরে গিয়াসাবাদ বা গয়সা-বাদ গ্রামেও ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন স্মৃতি। হিন্দুরাজাদের আমলে এই গ্রামের নাম ছিল বদ্রিহাট। পরবর্ত্তিকালে মুসলমান রাজত্বে গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরের নামানুসারে এই স্থানের

নাম হয় গিয়াসাবাদ বা গয়সাবাদ। এই গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ হিন্দুরাজাদের আমলে মহীপাল নগরী গয়সাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৫৩ সালে লেয়ার্ড সায়েব এখান থেকে দুটি মুদ্রা সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিল। ঐ মুদ্রাগুলির ওপর পালী ভাষার হরফে লেখা ছিল। লেয়ার্ড সায়েব এই অঞ্চলকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের আবাসস্থল রূপে বর্ণনা করেছে। Gastrel এবং Sherwill সায়েবও এই অঞ্চলে ভগ্নপ্রাসাদ, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন মৃৎপাত্রের টুকরো এবং পালী ভাষার হরফ সম্বলিত একাধিক শিলাখণ্ড ও স্বর্ণ মুদ্রা দেখে এই স্থানটিকে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বলে বর্ণনা করেছে। গয়সাবাদে জনৈক ফকীরের সমাধি আছে।

. ভরতপুর থানার অধীনে গীতগ্রাম থেকেও কিছু প্রাচীন প্রত্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে। এখান থেকে প্রাকগুপ্তযুগের মাটির শীলমোহর, শিলাখণ্ড, পোড়ামাটির মূর্ত্তি মুদ্রা আবিষ্কার করা হয়েছে।

মহীপাল থেকে কয়েক মাইল দূরে সাগরদিঘী গ্রাম। এই গ্রামে সাগরদিঘী নামে যে একটি বিরাট জলাশয় আছে সেটিও রাজা মহীপালের সময় খনন করা হয়। নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্টে মনে হয় ৭১০ শাকে সাগরদিঘীর প্রতিষ্ঠা ঃ—

শাকে সপ্তদশাব্দকে স্থিতা সাগরদীর্ঘিকা
পালবংশ কৃতং খাতং ব্রহ্মহামুক্তিহেতুনা ॥'

সাগরদিঘী থানার অধীন ভাঙ্গা মিলকি গ্রাম থেকেও পাল-সেন যুগের একাধিক শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। লালবাগ মহকুমার অধীন পসিয়া গ্রামের একটি পুকুর থেকেও একাধিক প্রাচীন নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।

কান্দী মহকুমার অধীন পাঁচথুপী অন্যতম প্রাচীন গ্রাম। পাঁচটি

বৌদ্ধস্তূপ (পঞ্চস্তূপ) থেকে পাঁচথুপী নামের উৎপত্তি—এরকম অনুমান করা হয়। এই অনুমানের ভিত্তি নেই বলা চলেনা। কারণ বৌদ্ধযুগে এ অঞ্চলে একাধিক স্তুপ থাকা বিচিত্র নয়।

কান্দীতে রুদ্র দেবের মন্দিরে অধিষ্ঠিত রুদ্রমূর্ত্তিটিও বুদ্ধ মূর্ত্তি বলে অনেকেই মনে করে।

এই সব নিদর্শন থেকে অনুমান হয়, পালযুগ তো বটেই, সম্ভবতঃ তার আগে থেকেই মুর্শিদাবাদের এতদঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত ছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

চূনাখালিতে আওলিয়া ফকিরের সমাধিফলকে ফেরোজ সুলতানের নাম উল্লেখ করা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ফেরোজ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করে।

গৌড়াধিপ হোসেন শাহর নামও জড়িয়ে আছে মুর্শিদাবাদে। তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী আজও এখানে প্রচলিত। হোসেন শাহ প্রথম জীবনে চাঁদপাড়ার (সাগরদিঘীর সন্নিকটে) জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে কাজ করতো। পরবর্ত্তীকালে নিজ প্রতিভাবলে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করার পর উক্ত ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা কর (খাজনা) ধার্য্যে চাঁদ পাড়াদান করে। একারণেই চাঁদপাড়ার নাম হয় "একানি চাঁদপাড়া"। যাই হোক, একানি চাঁদপাড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে হোসেন শাহর আমলের কিছু কিছু শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। হোসেন শাহর স্মৃতি বিজড়িত এই অঞ্চল, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। চাঁদপাড়ার কাছেই সেখের দীঘি হোসেন শাহর একটি কীর্ত্তি।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে ষোড়শ শতকে বাংলা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তার পেছনে হোসেন শাহ বংশীয়দের অনেকখানি অবদান ছিল। 'একানি চাঁদপাড়া' ও তৎসংলগ্ন এলাকা বাংলার

মুসলমান রাজত্বের উৎপত্তি স্থল।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবও মুর্শিদাবাদে লক্ষ্যণীয়। শ্রীনিবাসাচার্য্যও মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর দুই শিষ্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ মুর্শিদাবাদের তেলিয়া বুধুরী গ্রামের অধিবাসী।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকায় একাধিক শ্রীপাট এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মীয় প্রভাবের সাক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব চূড়ামণি জীব গোস্বামীর শিষ্য হরিপ্রিয়া ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট কুমারপাড়াও (মুর্শিদাবাদ থানা) উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাট কুমারপাড়ায় কষ্টিপাথরের রাধামাধব বিগ্রহ আছে। এ ছাড়াও নশীপুরে (মুর্শিদাবাদ থানা) রামানুজ সম্প্রদায়ের আখড়া এবং সাধকবাগে (জিয়াগঞ্জ থানা) আওলিয়া সম্প্রদায়ের আখড়ার প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব ও প্রসারের সাক্ষ্য বহন করে।

নববৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সময় মুসলমান সম্প্রদায়কেও এর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। সৈয়দ মর্তুজা নামে জনৈক মুসলমান ফকির বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুগত ছিল। তার রচনার কয়েকটি পদ আজও স্থানীয় লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। ছাপঘাটিতে মর্তুজার সমাধি ছিল। বর্ত্তমানে সেই সমাধি নিশ্চিহ্ন।

মুর্শিদাবাদের মন্দির সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। কিরীটেশ্বরী এবং রাধামাধবের মন্দির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরের অধিকাংশই আজ নিশ্চিহ্ন অথবা ভগ্নপ্রায়। জগৎশেঠের প্রতিষ্ঠিত জৈন মন্দির ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন। বর্ত্তমান মন্দিরটি অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরে স্ফটিক নির্ম্মিত মহাবীরের বিগ্রহ আছে।

কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে নেমিনাথের মন্দিরও প্রাচীন জৈন মন্দির। যখন থেকে কাশিমবাজার প্রধান বাণিজ্য বন্দর রূপে চিহ্নিত,

নেমিনাথের মন্দিরও তখন থেকেই প্রাধান্য লাভ করে। মন্দিরের মধ্যে শেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ নেমিনাথ এবং পার্শ্বনাথ এর বিগ্রহ ছিল। নেমিনাথের মূর্ত্তিটি পাথরের এবং পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত ছিল। মন্দিরের আশেপাশে জৈন ব্যবসায়ীদের আবাস ছিল। এছাড়াও কাশিমবাজারে ছিল আরও একটি দর্শণীয় শিবমন্দির। প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রাম কেশব। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১১ সালে। এই মন্দিরের দেওয়ালে ইঁটের ওপর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা ছিল। অদূরে বিষ্ণুপুরের কালীমন্দির। প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণেন্দ্র হোতা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ।

বড়নগরে রাণী ভবানীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ভবানীশ্বর মন্দির ও চারবাংলা মন্দির। এখানকার মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটা ও চূণবালির কাজ অষ্টাদশ শতকের এক অপূর্ব্ব শিল্প নিদর্শণ।

ভট্টবাটীতে (মুর্শিদাবাদ থানা) বঙ্গাধিকারীদের আমলে নির্ম্মিত মন্দিরেও ইঁটের ওপর খোদাই করা নানারূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। এই মন্দিরটি বর্ত্তমানে ভগ্নদ্দশায়।

নবগ্রাম থানার অধীন অমরকুণ্ডু (অমৃত কুণ্ডু) গ্রামে একাধিক প্রাচীন বিষ্ণু, বুদ্ধ ও সূর্য্যমূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রামের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ঐ স্থানেই বর্ত্তমান গঙ্গাদিত্যের মন্দিরটি নির্ম্মাণ করা হয়।

এছাড়া দেবীপুর এবং সাধকবাগের মন্দিরগুলিতেও একাধিক দেবদেবীর প্রাচীন মূর্ত্তি আছে।

মুর্শিদাবাদের কোন কোন মসজিদ বা সমাধি ভবনের কাছাকাছি একটা করে শিবমন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরগুলি সম্পর্কে কোন তথ্য বা ইতিহাস জানা যায় না। এমনকি এগুলি পার্শ্ববর্ত্তী মসজিদের

সমসাময়িক কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। সমসাময়িক হলেও এগুলির প্রতিষ্ঠা তৎকালীন নবাব নাজিমদের ধর্ম্ম উদারতার ফল অথবা লোক দেখানো প্রচার মাত্র সে প্রশ্নেও বিতর্ক আছে।

তবে যাই হোক্ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির আদান প্রদানের প্রমাণও পাওয়া যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রধানতঃ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদারতায় এবং পরবর্ত্তী-কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্ম তথা সংস্কৃতি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্দের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো।

জেলার বিভিন্ন পীর সায়েবের দরগায় বা ফকিরের আস্তানায়, পূজোপার্ব্বনে, মেলায় উভয় সম্প্রদায়ের জনগণকে একই সঙ্গে পাশা-পাশি বসে প্রার্থনা জানাতে বা মানত করতে দেখা যায়।

মহরম উপলক্ষ্যে মদিনায়, ইমাম হোসেনের দরগায়, দাদাপীরের মেলায় এ দৃশ্য আজও চোখে পড়ে। রঘুনাথগঞ্জে কাশিমের দরগা এবং ছাপঘাটিতে মর্তুজার দরগা তো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান। মর্তুজার দরগায় মানত করার সময় হিন্দুরা নিয়েছে আল্লার নাম আর মুসলমানরা মা কালীকে স্মরণ করেছে।

এ সব দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির আদান প্রদান কতো গভীর ছিল।

নদ নদীর গতি পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেশ হয়েছে খণ্ডিত। অনেক পুরানো স্মৃতি হয়েছে নিশ্চিহ্ন। সামাজিক পটেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। রাজনীতির উত্তাপে ওলট পালট হয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু জনপদ সংস্কৃতির ইতিহাসে সাংস্কৃতিক যুক্ত-ধারা আজও বর্ত্তমান॥

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস

"মসনদের কথা"

মুর্শিদাবাদ—শুধু একটা নাম নয়। একটা ইতিহাস। শুধু বাংলার নয়, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় নাম। ইতিহাসের অনেক উত্থান পতনের লীলাভূমি। শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা আর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে চকিত বিদ্যুতের মতোই দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের দীপশিখা।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছে—"The history of Murshidabad city is the history of Bengal during the eighteenth Century."

মুর্শিদাবাদ নগরীর ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের সমগ্র বাংলার ইতিহাস। সেই সঙ্গে বিহার এবং উড়িষ্যারও বটে। কারণ এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই এ ইতিহাসের শুরু। ভারতের ভাগ্যাকাশে তখনও মোগল রাজত্বের দাপট অব্যাহত। দিল্লীর মসনদে সম্রাট আওরংজেব। বাংলার সুবেদার তাঁরই নাতি বাহাদুর শাহর ছেলে প্রিন্স আজিমুশ্বান। সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা।

১৭০১ সাল। সম্রাট আওরংজেবের আদেশে করতলব খাঁ উপাধি

নিয়ে ঢাকায় এলো নতুন দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ। দাক্ষিণাত্যের কোন এক গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। ছোট থেকেই মানুষ হয়েছে ইস্পাহানের হাজী সফীর কাছে। সেখানেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ। নাম পালটে রাখা হল—মির্জ্জা হাদী। সামান্য বেতনে চাকুরী করতো বাদশাহী খাজাঞ্চীখানায়। ক্রমে বাদশাহর কৃপাদৃষ্টি পড়লো। মোগল সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি মানেই উন্নতি। দেওয়ান হলো মির্জ্জা হাদী ওরফে মুর্শিদকুলী।

দেওয়ানীর কাজটা জানা ছিল ভালোই। মুর্শিদকুলী জানতো ফাঁকি কোথায়। তাই বুদ্ধিমান দেওয়ান উঠে পড়ে লাগল ফাঁকির রাস্তা বন্ধ করতে এবং রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে। চালু হলো নতুন নতুন নিয়মকানুন। নতুনভাবে জরীপের কাজ শুরু হল। জায়গীর-দারদের ক্ষমতা হ্রাস করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো সব জমি। খাস জমির পরিমাণ বাড়লো। প্রথম বছরেই আয় হলো এক কোটী টাকা। রাজস্ব পাঠানো হলো দিল্লীতে। চিন্তিত, শঙ্কিত হলো অনেকেই। ক্ষুব্ধ হলো প্রিন্স আজিমুশ্বান। নতুন নায়েব আসার পর থেকেই আজিমুশ্বানের প্রভাব কমেছে। প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ। এতটা ঔদ্ধত্য সহ্য করা কঠিন। আর্জ্জি জানালো সম্রাট আওরংজেবের কাছে। সম্রাট বুদ্ধিমান। কাজের কদর বোঝে। নতুন দেওয়ান যাওয়ার পর থেকেই বিরাট অঙ্কের রাজস্ব এসেছে বাংলা থেকে। তাই মিষ্টি ভাষায় খারিজ করে দিলো আজিমুশ্বানের আরজি। দেওয়ানের প্রভাব বাড়লো। আজিমুশ্বানের প্রভাব কমলো। নতুন দেওয়ানকেই খাতির করে সবাই। কারণ তারা বুঝে নিয়েছে ক্ষমতাটা এখন দেওয়ানেরই বেশী। স্বয়ং সম্রাট দেওয়ানের ওপর প্রসন্ন।

ক্ষিপ্ত আজিমুশ্বান কয়েকজন মোসায়েবের পরামর্শে একদল সৈন্য পাঠালো দেওয়ানকে বধ করতে। রাস্তার মাঝখানে দেওয়ানের

পালকি অবরোধ করে দাঁড়ালো তারা অতর্কিতে। কিন্তু দেওয়ানের সাহসিকতায় ভয় পেয়ে পরক্ষণেই পালালো। মুর্শিদকুলী বুঝলো—তার পক্ষে আজিমুশ্বানের সঙ্গে ঢাকায় বাস করা অসম্ভব।

সভা ডাকলো দেওয়ান। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো দেওয়ানী উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মুখসুদাবাদে। আজিমুশ্বানকে না জানিয়েই সম্রাটের সম্মতি নিয়ে দেওয়ানখানা ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হলো মুখসুদাবাদে। সেটা ১৭০৩ সাল। সঙ্গে এলো দেওয়ানের বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীরা। আর এলো দেওয়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরামর্শদাতা—শেঠ মাণিকচাঁদ।

আজিমুশ্বানের সঙ্গে বিবাদ, মুর্শিদকুলীর প্রাণনাশের জন্য আজিমুশ্বানের ষড়যন্ত্র, ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে দেওয়ানী স্থানান্তর ইত্যাদি সব কথা সবিস্তারে মুর্শিদকুলী জানালো সম্রাটকে। ফলে সম্রাটের আদেশে ঢাকা ছেড়ে বিহারে যেতে হলো আজিমুশ্বানকে। ঢাকায় নামেমাত্র প্রতিনিধি থাকলো আজিমুশ্বানের ছেলে ফাররুখসের।

ইতিমধ্যে একদিন দাক্ষিণাত্যে মুর্শিদকুলী স্বয়ং সম্রাট আওরংজেবের সঙ্গে দেখা করে নজরানা দিলো প্রচুর, নানা অশান্তিতে বিব্রত সম্রাট নজরানা পেয়ে খুশী হয়ে মুর্শিদকুলীকে উন্নীত করলো নায়েব নাজিম পদে। সেটা ১৭০৪ সালেই।

সম্রাটের কাছ থেকে ফিরে এসেই মুর্শিদকুলী মুখসুদাবাদের নাম রাখলো—মুর্শিদাবাদ।

চকবাজারে তৈরী হল নতুন দরবারবাড়ী। চল্লিশ থামের ওপর বিরাট বাড়ী। নাম—'চেহেল্ সেতুন'।* নবাব প্রাসাদ হলো কুলুরীতে। বর্ত্তমান ইমামবাড়ীর পূর্ব্বদিকে। দু' মাইল দূরে মহিমাপুরে

*বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদে, চক মসজিদ যেখানে অবস্থিত, সেখানেই ছিলো 'চেহেল সেতুন'।

তৈরী হলো শেঠ মাণিকচাঁদের বাড়ী আর গদী। আশে পাশে গড়ে উঠলো আমীর ওমরাহদের বড় বড় ইমারত।

মোগল রাজত্বে প্রতিটি সুবায় ছিল নিজস্ব টাঁকশাল। ঢাকাতেও ছিল। মাণিকচাঁদের পরামর্শে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মুর্শিদকুলী চালু করলো—মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল বর্ত্তমান কেল্লার কাছে ১৭০৫ সালে। মুর্শিদাবাদের টাকার কদর, ঢাকার তৈরী টাকার চেয়েও বেশী। ঢাকার গুরুত্ব কমছে। মুর্শিদাবাদের বাড়ছে।

মুর্শিদকুলী রাজনীতি করে। ব্যবসা করে মাণিকচাঁদ। অবশ্য মাণিকচাঁদও রাজনীতি বোঝে ভালোই। নবাব দরবারে মাণিকচাঁদের অনেক সম্মান। মুর্শিদকুলীর প্রিয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই মাণিকচাঁদই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে উঠলো নবাবের খাজাঞ্চী।

ব্যবসাপত্তর নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মতান্তর হয়েছে বহুবার। মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিয়েছে মাণিকচাঁদ।

নতুন ভূমিনীতি চালু করে, জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাজস্বের পরিমাণ দাড়ালো এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। নবাবের কড়া হুকুম—খাজনা সময়মত জমা না দিলে জমিদারী থাকবে না, সেই সঙ্গে পেতে হবে শাস্তি। জমিদারী বাঁচাতে আর শাস্তি এড়াতে খাজনা জমা পড়ছে ঠিক সময়ে—নবাবের খাজাঞ্চী মাণিকচাঁদের গদীতে। শিক্কা টাকায় রাজস্ব যাচ্ছে দিল্লীতে বাদশাহী দরবারে।

তখনকার দিনে জনসাধারণও মোটামুটি সুখেই ছিল। টাকায় পাঁচ মণ চাল। পনের সের গাওয়া ঘি এর দাম এক টাকা মাত্র।

চুরি ডাকাতিও ছিল না। কোথাও চুরি ডাকাতি হলেই নবাবের দরবারে ডাক পড়তো সেই এলাকার ফৌজদারের। যেমন করেই হোক চোর ধরতেই হবে আর ধরা পড়লেই মৃত্যুদণ্ড। নবাবের আদেশ। চোর ধরতে না পারলে ফৌজদারের শাস্তি।

মাণিকচাঁদের বয়স হয়েছে। ছেলে পুলে নেই। তাই গদীতে বসিয়েছে ভাগনে ফতেচাঁদকে। ফতেচাঁদও বুদ্ধিমান। কারবার দেখাশোনা করে। তারও অবাধ যাতায়াত নবাব দরবারে।

হঠাৎ খবর এলো—আওরংজেব মারা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—দিল্লীর সিংহাসনের দাবীদার অনেক। চললো নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। মুর্শিদকুলী ঘটনা প্রবাহর ওপর নজর রাখলো। কে সম্রাট হবে কিছুই বলা যায় না। তাই আপাততঃ দেখা ছাড়া উপায় নেই। আজিমুশ্বানকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলো তার ভাই জাহান্দার শাহ। ফাররুখসের এগিয়ে এল লড়াই করতে। সাহায্য চাইলো মুর্শিদকুলীর। চতুর নবাব এড়িয়ে গেল। ফাররুখসের এর ভাগ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না; তাই তাকে এই অবস্থায় সাহায্য করে কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নয় মুর্শিদকুলী। নবাবের আচরণে ক্ষুব্ধ হলো ফাররুখসের তবে মুখে কিছু বললো না। পাটনার সৈয়দ ভাইরা রাজনীতির হিসাব নিকাশ করে সাহায্য করলো ফাররুখসেরকে। শুধুতো জনবল আর সৈন্য হলেই চলবে না। তার সঙ্গে টাকাও চাই। টাকা যতক্ষণ থাকবে সৈন্যরা ততক্ষণ কথা শুনবে। কাজেই টাকা অবশ্যই চাই। তারও ব্যবস্থা হলো। বাংলার রাজস্ব যাচ্ছে দিল্লিতে। মাঝপথেই লুট করে নিল সৈয়দ ভাই। এর ওপর আবার গোপনে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে ঝুঁকি নিল ফতেচাঁদ।

জাহান্দার শাহকে বিতাড়িত করে বাদশাহী মসনদে বসলো ফাররুখসের। তবে বেশীদিন থাকতে পারলো না। দ্রুত ওলট পালট হয়ে গেল। একজন করে আসছে আর যাচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহ হলো মুহম্মদ শাহ। মুর্শিদকুলী স্বীকার করলো বাদশাহকে। নজরানা দিলো প্রচুর।

সম্রাটের দরবারে—শেঠদের খাতির আর মর্য্যাদা নবাবের চেয়ে কম নয় বরং বেশী। নানা কারণে শেঠদের ওপর সম্রাট প্রসন্ন।

আবার নবাবের তো প্রধান পরামর্শদাতা ফতেচাঁদ। বিপদে আপদে ভরসা।

নিজের কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তায়, নবাবের তদ্বিরের জোরে এবং সম্রাটের প্রসন্নতায় ১৭২৪ সালে জগৎশেঠ উপাধি দিয়ে ফতেচাঁদকে সম্মানিত করলো স্বয়ং বাদশাহ।

১৭২৫ সালে মারা গেল মুর্শিদকুলী। তারই ইচ্ছামত কাটরা মসজিদের সিঁড়ির নীচে সমাধিস্থ করা হলো তাকে।

মুর্শিদকুলীর ইচ্ছে ছিল নাতি সরফরাজকে মসনদে বসাবার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সব সময় ইচ্ছাপূরণ হয় না। তাই মুর্শিদকুলী বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও, ফতেচাঁদের অত্যন্ত গোপনীয় তদ্বিরে নবাব হলো উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, সরফরাজের বাবা, মুর্শিদকুলীর জামাই সুজাউদ্দিন।

সরফরাজ অনুমান করেছিলো. ঠিকই। কিন্তু প্রমাণ ছিলো না হাতে। তবু রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলো বাবার বিরুদ্ধে। শেষ পর্য্যন্ত দিদিমার পরামর্শ মেনে নিয়ে স্বীকার করে নিলো নবাবকে।

নবাবী করে সুজাউদ্দিন। সব সময় পাশে থাকে জগৎশেঠ। উড়িষ্যা থেকে আসবার সময় তিন জন বিশ্বস্ত বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীকেও সঙ্গে এনেছে সুজা। হাজী আহম্মদ, আলীবর্দ্দি খাঁ আর রায়রায়ান আলমচাঁদ। আলীবর্দ্দির ওপরেও বিশ্বাস ছিল সুজার।

জনসাধারণ সুজার আমলেও ভালো ভাবেই থাকতো। তখনও টাকায় পাঁচ মণ মিহি চাল পাওয়া যেত। মাসিক চার টাকা আয়ে দুবেলা পোলাও কালিয়া খাওয়া সম্ভব ছিল। অবশ্য টাকাটা ছিল দামী। জিনিষপত্র ছিল সস্তা।

সুজাউদ্দিন বিলাসী নবাব। দিলদরিয়াও বটে। নগরের ভেতরে অথবা বাইরে যেখানেই যেতো নবাব, সঙ্গে থাকতো দীর্ঘ শোভাযাত্রা পদাতিক আর অশ্বারোহী মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার। আমীর ওমরাহ

আর হাতী ঘোড়ার তো কথাই নেই। বহুমূল্য রত্ন-হীরক খচিত পোশাক পরে হাতির পিঠে নবাব। সঙ্গে বিশাল বাহিনী। মেজাজ খুশ্ থাকলে যাকে তাকে যা ইচ্ছে উপহার দিতো নবাব। উপহারের তালিকায় হাতী ঘোড়াও থাকতো।

মুর্শিদকুলীর তৈরী প্রাসাদ মনঃপুত হয়নি সুজার। তাই তৈরী হলো নতুন রমণীয় প্রাসাদ। তৈরী হলো নতুন দরবার ঘর, মন্ত্রণাঘর, বিশ্রামঘর, জলসাঘর। চক্‌বাজারে তৈরী হলো বিরাট ত্রিপলিয়া তোরণ। ওপরে নহবৎ খানা। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে তৈরী হলো নতুন বাগানবাড়ী সম্পূর্ণ মোগল কায়দায়। নাম হলো রোশনীবাগ আর ফর্হাবাগ। নবাবের বিলাস ভবন তথা বিলাস কানন।

ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি হয়েছে মন কষাকষিও হয়েছে কয়েকবার। পরে আবার আপোষও হয়েছে। বেশী ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়নি নবাব সুজাউদ্দিনকে। যখনই সমস্যা এসেছে, সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, পার করে দিয়েছে জগৎশেঠ, আলমচাঁদ প্রমুখ বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীরা।

নবাব দরবারঘরে বসে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শোনে, বিচার করে। শাসনকাজ পরিচালনা করে। সুবার খোঁজখবরও নেয়। তবে সবচেয়ে বেশী সময় কাটায় সুন্দরী পরিবেষ্টিত হয়ে হারেমে। প্রায় সারা বছর ধরেই সুজাউদ্দিন সুন্দরী নারীদের নিয়ে বসন্ত উৎসব করে হারেমে অথবা ফর্হাবাগে। নবাবের নবাবী বিলাস। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিলাসী ছিলো সুজাউদ্দিন।

বিলাস করতে হলে চাই টাকা। বিলাসের স্রোতে এত টাকা রাজকোষ থেকে দিলে, অন্য কাজ চলবে কি করে? দিল্লীতে ঠিক সময় রাজস্ব পাঠাতে হবে, তাছাড়া নানা রকম বিপদ আপদও আছে।

সৈন্য সামন্তর মাইনে আছে, আছে আরও নানান খরচা। তাহলে? চিন্তিত হয় জগৎশেঠ আর রায় রায়ান। পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে। জমিদার, ব্যবসাদার আর প্রজাদের ওপর চাপে নতুন কর। নাভিশ্বাস উঠছে করদাতাদের। বিলাসে ডুবে আছে নবাব। এত করেও মেটানো যাচ্ছে না নবাবের টাকার চাহিদা। মাথা ঘামছে জগৎশেঠ আর রায় রায়ান আলমচাঁদের।

যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত এতটা বিলাস আর সহ্য হলো না নবাবের। বয়স তো হয়েছে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো সুজাউদ্দিন। সমাধিস্থ হলো ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রোশনাবাগে।

বহু প্রত্যাশা নিয়ে মসনদে বসলো সরফরাজ। পূর্ণ হলো তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা।

মারা যাওয়ার আগে সুজাউদ্দিন বলেছিলো সরফরাজকে—হাজি আহম্মদ, আলীবর্দ্দি, জগৎশেঠ আর রায় রায়ানের পরামর্শ মত চলতে। সে কথা মেনে নিয়েছিলো সরফরাজ যদিও সে জানতো মুর্শিদকুলা মারা যাওয়ার পর জগৎশেঠের গোপন তদ্বিরেই তখন নবাব হতে পারেনি সরফরাজ। প্রতিশোধের একটা প্রবল ইচ্ছা জেগেছিলো সরফরাজের মাথায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দমন করেছে সে ইচ্ছেটা।

আলীবর্দ্দি বিহারের শাসনকর্ত্তা। হাজি আহম্মদ, জগৎশেঠ আর রায়রায়ান—নতুন নবাবের মন্ত্রী।

সরফরাজ বয়সে তরুণ। রাজকার্য্যে অকর্ম্মণ্য এবং অপদার্থ। বিলাসিতায় কিন্তু বাপের ওপর দিয়ে যায়। দেশ বিদেশের বাছাই করা পনের শো সুন্দরী রমণী ছিল তার হারেমে।* চরম ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নবাব। ইয়ার বন্ধুরা নবারের চারপাশে থাকতো প্রায় সব

* His seraglio is said to "have consisted of 1500 women of various descriptions" -History of Bengal—Stewart.

সময়। বৃদ্ধ ফতেচাঁদ এড়িয়ে চলে নবাবকে তবে সেটা মুখে বা আচরণে প্রকাশ পায়নি কোনদিন।

এই সময় আবার দিল্লীর সিংহাসন টলমল। নাদির শাহর আক্রমণ। শঙ্কিত নবাব। শঙ্কিত জগৎশেঠ, হাজি আহাম্মদ, রায় রায়ান। প্রত্যেকের স্বার্থই যে প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত। কার পাশে থাকবে নবাব? নাদির শাহ না মুহম্মদ শা? অনেক ভাবনা চিন্তার পর মন্ত্রীদের পরামর্শে, নাদির শাহর নামে টাকা ছাড়া হলো মুর্শিদাবাদের টাকশাল থেকে। কিন্তু নাদির শাহ দিল্লী ছাড়ার পর আবার এসেছে মুহম্মদ শা। নবাবের আচরণে তার ওপর অসন্তুষ্ট বাদশাহ। কি ভাবে বাদশাহর সন্তুষ্টিবিধান করা যায় ভেবে পাচ্ছে না সরফরাজ।

দরবারে জগৎশেঠ, হাজি আর রায়রায়ানের প্রভাবটা ভালো চোখে দেখতো না সরফরাজের ইয়ার বন্ধুরা। মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা বোঝাতে চেষ্টা করতো নবাবকে। বিশেষ করে হাজিকে তারা যেন কোন মতেই সহ্য করতে পারতো না। ইয়ার বন্ধুদের ক্রমাগত চাপে শেষ পর্য্যন্ত হাজিকে বিদায় দিলো সরফরাজ। হাজি নিপুণ অভিনেতা। অব্যাহতি পেয়ে, যেন বেঁচে গেল—এ রকম একটা ভাব দেখিয়ে চলে গেল দরবার ছেড়ে। মনে মনে হেসেছিলো হাজি।

ইতিমধ্যে আরও ঘটনা ঘটেছে। মহতাপচাঁদের বৌ অপরূপ সুন্দরী। বড় জোর বছর পনের বয়স।* কিন্তু তার রূপের জুড়ি তামাম ভারতবর্ষে মেলা ভার। ইয়ার বন্ধুদের মুখেই শুনলো সরফরাজ। ধৈর্য্য ধরতে জানে না নবাব। তাই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম—এখনই চাই। শুধু একবার দেখতে চাই এই অপরূপা

* হলওয়েল সায়েব বলেছে এগারো বছর বয়সের

সুন্দরীকে। নবাবের খবর গেলো শেঠ বাড়ীতে। বৃদ্ধ ফতেচাঁদ তো হুকুম শুনে বিস্ময়ে হতবাক! লজ্জায়, ঘৃণায় আর অপমানে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে মহতাপ। তবুও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পরিবারের মান মর্য্যাদার কথা তুলে ফতেচাঁদ অনুরোধ জানালো নবাবকে এই ইচ্ছে দমন করতে কিন্তু নবাব অটল। তাই শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে ঢাকা পালকিতে গোপনে পাঠানো হলো শেঠ বাড়ীর বৌকে সরফরাজের প্রাসাদে। কিছুক্ষণ পর, শুধুমাত্র তাকে দেখেই নাকি ফেরৎ পাঠিয়েছিলো সরফরাজ। বংশের মান মর্য্যাদার কথা স্মরণ রেখে বৌকে আর ঘরে নিতে পারেনি মহতাপচাঁদ। ১

এ হলো একদিকের কাহিনী। হলওয়েল এবং অর্মে সায়েবও এ কথা বলেছে। অন্য কাহিনীও আছে। মুর্শিদকুলী নাকি ব্যক্তিগত সাত কোটি টাকা জমা রেখেছিলো শেঠদের বাড়ীতে। সরফরাজ সেই টাকা ফেরৎ চায় ফতেচাঁদ আর মহতাপচাঁদের কাছে। জগৎশেঠ নাকি অস্বীকার করেনি টাকার কথা, তবে সময় চেয়েছিলো নবাবের কাছে। সময় দিতে অস্বীকার করে জগৎশেঠকে চূড়ান্ত অপমান করে সরফরাজ। এ সব কাহিনী সত্য কি না অথবা কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে সাত কোটি টাকা পাওনার কাহিনীটা একটু যেন ধোঁয়াটে বলেই মনে হয়। কারণ মুর্শিদকুলী হঠাৎ মারা যায়নি। টাকা যদি তার জগৎশেঠের কাছে পাওনা থাকতো তাহলে অন্ততঃ মৃত্যুর পূর্ব্বেও মুর্শিদকুলী সে কথা বলতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ মুর্শিদকুলী মারা যাওয়ার পরে প্রায় চৌদ্দ বছর নবাবী করেছে সুজাউদ্দিন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কিন্তু টাকার কথা উঠেছিলো বলে সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখ নাই।

তবে ঘটনা যাই হোক, এটা ঠিক যে সরফরাজের উদ্ধত আচরণ

'The young woman was sent to the Palace in the evening and after staying there a short space, returned unviolated indeed but dishonoured to her husband',—Orme's Indostan.

এবং কারণে বা অকারণে সম্মানীয় মন্ত্রী তথা ব্যক্তিদের প্রতি অপমান সূচক কথাবার্ত্তায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলো অনেকেই। হাজি সরে গিয়েছিলো আগেই। রায়রায়ান আর জগৎশেঠও নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারছিলো না। ফলে যারা এতদিন ছিল মন্ত্রী সেই ত্রয়ী—হাজী, জগৎশেঠ আর রায়রায়ান ক্রমে হয়ে উঠলো সরফরাজের শত্রু। শুরু হল ষড়যন্ত্র। স্থির হলো—মসনদ থেকে সরাতে হবে সরফরাজকে।

নানান লোক মারফৎ সরফরাজের বিরুদ্ধে নানা কথা রংচং দিয়ে তোলা হলো বাদশাহর কানে। দিল্লীর দরবারে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও যাতায়াত আছে তাদের দু একজনকে হাত করে, তাদের মাধ্যমেই বাদশাহর কাছে কৌশলে জানানো হলো নানা অভিযোগ। নাদির শাহর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় নবাবের ভূমিকায় মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলো বাদশাহ। কাজেই অল্প অল্প আগুনে ঘি এর ছিটে পড়তেই জ্বলে উঠলো। মুহম্মদ শাহর টাকার খুবই প্রয়োজন। অথচ রাজকোষ একেবারে শূন্য। তাই খুবই চিন্তিত মুহম্মদ শা। ঠিক এমনি সময় প্রস্তাব এলো গোপনে বাদশাহর কাছে। আলীবর্দ্দি বাংলার নবাব হতে পারলে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে বাদশাহকে। এই দুঃসময়ে এমন একটা প্রস্তাব কে উপেক্ষা করতে পারে? বাদশাহ তো আর মুনি ঋষি নয়। মুহম্মদ শা সোজাসুজি কিছু বললো না। হাজার হলেও দিল্লীশ্বর তো বটে। ভাবখানা অনেকটা এই রকম—'তোমরা যা ভালো বোঝ কর।' ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। এই সামান্য কথাটুকু আদায়ের জন্যই তো এত ভূমিকা, এত অভিনয়, এত প্রতীক্ষা। বাকী কাজটুকু এমন কিছু নয়। ভিত তৈরী। গাঁথতে যেটুকু সময়।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্রের তিন নেতা একেবারে স্বাভাবিক। কোন পরিবর্ত্তন নেই। নবাবের চরম এবং পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই আচরণ। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

ওদিকে আলীবর্দ্দিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দিল্লীর সবুজ সঙ্কেত। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো আলীবর্দ্দি। খবর পেয়েই অগ্রসর হলো মুর্শিদাবাদের দিকে। সরফরাজ তখন সুন্দরী পরিবেষ্টিত হয়ে হারেমে বসে আরাম করছে। হারেমে বসেই খবরটা পেলো। সঙ্গে সঙ্গেই বাধা দিতে ছুটলো সসৈন্যে। গিরিয়ার প্রান্তরে মুখোমুখি হলো উভয় পক্ষ। লড়াই চললো উভয় পক্ষে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলো নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি গাউস খাঁ। কিন্তু তবুও রোধ করতে পারেনি আলীবর্দ্দির গতি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছে জগৎশেঠের টাকার প্রলোভনে, নবাবের কামান বন্দুকের মধ্যে গুলি বারুদের পরিবর্ত্তে রাখা ছিল ইঁট, বালি ইত্যাদি। এ কাহিনী সত্য কি না জানা যায় না। তবে জগৎশেঠের পক্ষে এ রকম করা অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক সরফরাজ স্বয়ং যুদ্ধ করতে নেমেছিলো প্রান্তরে। কিন্তু এগোতে পারেনি বেশী দূর। প্রতিপক্ষের গুলি অব্যর্থ নিশানায় এসে লাগলো মাথায়। হাতীর পিঠেই ঢলে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো নবাব সরফরাজ। গিরিয়া থেকে হাতী বয়ে নিয়ে এলো রক্তাক্ত নবাবের মৃতদেহ রাজধানী মুর্শিদাবাদে। কবর দেওয়া হলো নাগিনাবাগে। শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়। মুর্শিদকুলি খাঁর বংশের শেষ। সার্থক হলো হাজির কূট বুদ্ধি আর তৎপরতা, রায়রায়ানের সহযোগিতা আর জগৎশেঠের টাকা।

মুর্শিদাবাদের নবাবদের মধ্যে একমাত্র সরফরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়।

মসনদে বসলো আলীবর্দ্দি। পরামর্শদাতা হাজি আর জগৎশেঠ। রায়রায়ান যুদ্ধ করতে গিয়ে হয়ে পড়েছিলো পঙ্গু। শেষ পর্য্যন্ত নাকি আত্মহত্যা করে শান্তি পায়।

আলীবর্দ্দি বুঝেছিলো ইংরেজদের উদ্দেশ্য। অন্ততঃ এটুকু বুঝেছিলো যে ইংরেজদেরকে বাড়তে দিলেই তারা বাড়বে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো গদীর দিকেই হাত বাড়াবে। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলো আলীবর্দ্দি।

মসনদে বসেই সহকারী নির্ব্বাচনের কাজটা সেরে ফেলতে হলো দ্রুত। হাজি তো আছেই, আছে জগৎশেঠ। এদের দুজনের কাছে নবাব কৃতজ্ঞ। দেওয়ান হলো চিন্ময় রায়, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর।

সরফরাজের বেগমদের যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ঢাকায়। সরফরাজের ধনসম্পত্তি আলীবর্দ্দি রাখলো নিজের কবজায়।

কিন্তু শান্তিতে নবাবী করতে পারেনি আলীবর্দ্দি। উড়িষ্যার রুস্তমজঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে মানতে চায় না নবাবকে। কাজেই উড়িষ্যার দিকে ছুটতে হলো আলীবর্দ্দিকে। রুস্তমজঙ্গকে পরাস্ত করে ফিরে এলো মুর্শিদাবাদে। বিশ্রাম নিতে না নিতেই, 'হর হর মহাদেও' শব্দে কেঁপে উঠলো বাংলা। মারাঠারা আক্রমণ করলো প্রচণ্ডভাবে। ব্যাপক আক্রমণ চারিদিক থেকে। সেই সঙ্গে অবাধ লুঠতরাজ আর নির্য্যাতন। গ্রাম পুড়েছে। শহর জ্বলেছে। পালিয়ে গেছে গ্রাম আর শহর ছেড়ে মানুষ।

আলীবর্দ্দি দিশাহারা। নিরুপায় মন্ত্রীরা। নবাব একদিকে যখন একদল মারাঠার মোকাবিলা করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্য দিক থেকে আসছে আর এক দলের আক্রমণ।

কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসবে বলতে পারে না কেউ। ব্যাপক লুঠতরাজের ফলে রাজ্যে উঠছে হাহাকার। রাজকোষ শূন্য। আদায় হয় না রাজস্ব। মাইনে না পেয়ে সৈন্যরা বিমুখ। ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ। কারবার গুটিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে মহাজন, ব্যবসাদার।

সাধারণ লোক বর্গীর * ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ঘর, সংসার, জমিজমা সবকিছু ছেড়ে।

নবাবের এই দুঃসময়ে টাকা জুগিয়ে দিলো জগৎশেঠ। সৈন্যদের মাইনে দেওয়া হলো। আবার তারা প্রস্তুত হলো। নবাবের মান আপাততঃ বাঁচলো। কিন্তু এত করেও ঠেকানো গেল না বর্গীর অত্যাচার। বছরের পর বছর ধরে আক্রমণ। সেই সঙ্গে অত্যাচার আর লুঠতরাজ।

ইতিমধ্যে আলীবর্দ্দির একদা আশ্রিত মীর হাবিব যোগ দিয়েছে মারাঠাদের সঙ্গে। মুর্শিদাবাদের হালচাল আর খবরাখবর তার ভালোমতই জানা। মারাঠাদের তাড়িয়ে দিতে আলীবর্দ্দি তখন কাটোয়ায়। মুর্শিদাবাদ ফাঁকা। খবরটা পেয়েই কিছু মারাঠা সৈন্য নিয়ে মীর হাবিব অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো জগৎশেঠের গদীতে। দুকোটি অর্কট টাকা লুঠ করে হাওয়া হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই।

এর কয়েকদিন পরই নবাবের একদল সৈন্য হঠাৎ লুঠ করলো মহিমাপুরের গদী। জগৎশেঠ তো হতভম্ব। এ লুঠ কারও প্ররোচনায়, গোপন ইঙ্গিতে অথবা অর্থাভাবে না বিদ্রোহের প্রকাশে সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। নবাব সৈন্যের আচরণে ক্রুদ্ধ জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গেলো ঢাকায়। অবশিষ্ট ছোট-মাঝারী-বড় মহাজনরাও জগৎশেঠের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেরী করলো না। মাথায় হাত দিলো আলীবর্দ্দি।

এদিকে আফগান বিদ্রোহ। ওদিকে বর্গীর হাঙ্গামা অব্যাহত।

* বর্গী শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছে সংস্কৃত শব্দ বর্গ থেকে বর্গী শব্দের উৎপত্তি। কেউ বলেছে পারশী শব্দ বাগি অর্থাৎ বিদ্রোহী থেকে এর উদ্ভব। আবার কারও মতে —মহারাষ্ট্রিয় শব্দ বারগীর অর্থাৎ অশ্বারোহী থেকে বর্গী শব্দের উৎপত্তি। মনে হয় শেষোক্ত মতই সঠিক।

খবর এলো কয়েকজন আফগান সেনাপতি মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দারুণ অর্থাভাব নবাবের। জগৎশেঠ নেই মুর্শিদাবাদে।

অনেক অনুনয় বিনয় করে, লোক পাঠিয়ে, অভিমান ভাঙ্গিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো বৃদ্ধ ফতেচাঁদকে। নবাব জানে—জগৎশেঠ না থাকলে নবাব অচল, তবে নবাব না থাকলেও জগৎশেঠ সচল।

অসময়ে নবাবকে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে ঘষেটি বেগম। পরে আরও টাকা দিয়েছে জগৎশেঠ। শান্ত হয়েছে নবাব সৈন্য। প্রস্তুত হয়েছে আবার লড়তে।

ওদিকে আর এক দুঃসংবাদ। আলীবর্দ্দির জামাই, সিরাজের বাবা জৈনুদ্দিন ছিলো পাটনার শাসনকর্ত্তা। নবাব সৈন্যবাহিনী থেকে বিতাড়িত হয়ে একাধিক আফগান সেনাপতি বসবাস শুরু করলো পাটনায়। জৈনুদ্দিন ছিল মোটামুটি সরল প্রকৃতির ভালো মানুষ। স্থির করলো—এই আফগান সেনাপতিরা ভাল যোদ্ধা। এদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করে যদি নিজের বাহিনীতে নিযুক্ত করা যায় তাহলে দু'কূল বাঁচবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনাও থাকবে না। নিজের বাহিনীও নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হবে। ভেবে চিন্তে জৈনুদ্দিন অনুমতি চাইলো আলীবর্দ্দির। প্রথমে মত দিতে চায় নি আলীবর্দ্দি। কিন্তু জৈনুদ্দিনের বারংবার অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবে সম্মতি দেয় বৃদ্ধ নবাব।

জৈনুদ্দিন আমন্ত্রণ জানিয়ে আফগান সেনাপতিদের নিয়ে এলো নিজের দরবারে। কথা বলতে বলতে অতর্কিতে আফগান সেনাপতিরা আক্রমণ করলো জৈনুদ্দিনকে। বাধা দেবার সময়টুকুও পেলো না। নৃশংসভাবে হত্যা করা হল জৈনুদ্দিনকে। হত্যা করা হলো জৈনুদ্দিনের বাবা, আলীবর্দির বড় ভাই হাজি আহম্মদকেও। শুধু তাই নয়, আফগানরা প্রাসাদ সহ সমগ্র বিহার দখল করে নিলো। বন্দী হলো আমিনা বেগম সহ জৈনুদ্দিনের পরিবারবর্গের সকলেই। এদেরকে

খোলা গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে।

খবর শুনে আলীবর্দ্দি মর্মাহত। প্রায় মুহ্যমান। সসৈন্যে রওনা হলো পাটনার দিকে। শত্রুকে পরাস্ত করে আমিনা সহ সকলকে মুক্ত করে ফিরে এলো মুর্শিদাবাদে।

পাটনার শাসনকর্ত্তা হলো কাগজে কলমে সিরাজ। কাজে রাজা জানকী রাম।

আলীবর্দ্দির রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। অশান্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই দিন কাটাতে হয়েছে তাকে। রাজত্বের বেশীর ভাগ সময়টা কেটে গেছে হানাদার আর বিদ্রোহীদের মোকাবিলায়। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির ছলে ডেকে এনে হত্যা করতে হয়েছে। রাজনীতিতে কৌশল একটা বড় কথা ঠিকই। কিন্তু আলীবর্দ্দির মতো যোদ্ধা নবাবের পক্ষে এরকম কাজ শোভনীয় নয়।

আলীবর্দ্দি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, প্রজাবৎসল নবাব। তাকে বলা হতো—'বাংলার আকবর'। প্রজাদের সুবিধা, অসুবিধা এবং সমস্যার দিকেও নজর ছিলো নবাবের। আলীবর্দ্দির রাজনৈতিক তথা দৈনন্দিন কাজে প্রেরণা দিয়েছে তার বেগম। স্পষ্টতঃ আলীবর্দ্দির জীবনে তার বেগমের অবদান ছিল অনেকখানি।

কিন্তু শান্তি পায়নি আলীবর্দ্দি। শুধু বাইরেই নয়, নিজের সংসারেও অশান্তি। আদরের নাতি সিরাজ উদ্ধত, বেপরোয়া। স্নেহান্ধ বৃদ্ধ সহ্য করেছে তার সব অত্যাচার। আলীবর্দ্দির দুই মেয়ে ঘসেটি আর আমিনা দ্বিচারিনী। হোসেন কুলী খাঁর প্রতি উভয়েই আসক্ত। আলীবর্দ্দি সবই জানতো, তার বেগমও জানতো। জানতো আরো অনেকেই। নিজের বংশের কলঙ্ক দুর করতে আলীবর্দ্দি ও

তার বেগমের সম্মতি নিয়ে সিরাজের আদেশে হত্যা করা হলো হোসেন কুলীকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য রাস্তায়। হত্যা করা হলো তার অন্ধ ভাইকে। রেহাই পায়নি হোসেন কুলীর ভাইপোও। কেউ কেউ মনে করে এই নির্দ্দোষীর রক্তপাতই আলীবর্দ্দি বংশের ধ্বংশের কারণ।*

শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার মধ্যে শেষের দিনগুলো কাটিয়েছে নবাব আলীবর্দ্দি। উপদেশ দিয়েছে সিরাজকে। ভবিষ্যৎ নবাবকে। সিরাজ মেনে নিয়েছে দাদুর পরামর্শ আর উপদেশ।

জীবনের শেষের দিকে রোগশয্যায় দিন গুণেছে আলীবর্দ্দি। ইতিমধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে ঘসেটি এসেছে মতিঝিলে—নিজের প্রাসাদে। ঘসেটির স্বামী নওয়াজেস অপুত্রক থাকায় দত্তক নিয়েছিলো সিরাজের ভাই এক্রামউদ্দৌলাকে।

আলীবর্দ্দি অত্যন্ত স্নেহ করতো সিরাজকে, তাই মসনদের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেছিলো সিরাজকেই।

অপরদিকে মাসী ঘসেটিকে দেখতে পারতো না সিরাজ। এমনকি শোনা যায়, ঘসেটির মতিঝিল প্রাসাদের জাঁকজমক আর সৌন্দর্য্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই সিরাজ তৈরী করে হীরাঝিল প্রাসাদ।

ঘসেটির ইচ্ছে ছিল—এক্রাম নবাব হোক। চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু সফল হয়নি।

১৭৫৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো বিচক্ষণ নবাব আলীবর্দ্দি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোসবাগে দাদুকে সমাধি দিয়ে এসে মসনদে বসলো সিরাজদ্দৌলা—Lamp of the state.

আলীবর্দ্দির উপদেশ—ইংরেজদেরকে বাড়তে দিও না—ভুলে

* মুতাক্ষরীন এ এরকম কথার উল্লেখ আছে

যায়নি সিরাজ। মসনদে বসেই সিরাজ ভাবলো—দুটো কাজ প্রথমেই করা দরকার। প্রথমতঃ ইংরেজ বণিকদের দমন করা। আর দ্বিতীয়তঃ নিজ পরিবারের মধ্যে যারা এতদিন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের শায়েস্তা করা।

আলীবর্দ্দির রাজত্বকালেই মারা গেছে ফতেচাঁদ। মহিমাপুরের গদীতে বসেছে তার দুই নাতি মহতাপচাঁদ আর স্বরূপচাঁদ।

বসন্ত রোগে মারা গেছে নওয়াজেসের কলিজা—সিরাজের ভাই এক্রাম। শোকে মুহ্যমান নওয়াজেসও বাঁচেনি। বেঁচেছে ঘসেটি।

প্রথম থেকেই ভয় ছিল ঘসেটির। সিরাজ মসনদে বসার পর থেকে ভয়টা আরও বেড়েছে তবু প্রস্তুত হয়েই আছে সে। ঢাকায় সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভ। ঘসেটির দেওয়ান। শোনা যায় হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর ঘসেটির মন টেনেছিলো রাজবল্লভ। তাই দেওয়ানও ভীত। বলা যায় না, তার অবস্থাও হতে পারে হোসেন কুলীর মতো। সতর্ক ছিল ঘসেটি। আরও বেশী সতর্ক রাজবল্লভ।

প্রচুর টাকা দিয়ে প্রস্তুত রাখা হলো দু হাজার সৈন্যকে। একহাতে টাকা অপর হাতে অস্ত্র নিয়ে শপথ করলো তারা—ঘসেটির জীবন মান রক্ষা করবে তারা। রক্ষা করবে মতিঝিল প্রাসাদ।

রাজবল্লভ কলকাতায় চিঠি লিখে ছেলে কৃষ্ণদাসকে জানায় সব পরিস্থিতি। পরামর্শ দেয় সব ধনরত্ন নিয়ে ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে। কাশিমবাজার কুঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। কারণ বিপদে আপদে রক্ষা করবে ইংরেজ, নবাব নয়।

সিরাজ আক্রমণ করলো মতিঝিল প্রাসাদ। ঘসেটির টাকা নিয়ে যে দু হাজার সৈন্য সেদিন শপথ করেছিলো তারা পালালো অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘসেটী আর নওয়াজেসের সঞ্চিত বিপুল অর্থ আর সম্পদ লুঠ

করে নিলো সিরাজ। ঘসেটিকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো হীরাঝিল প্রাসাদে। সেখানেই নজরবন্দী হয়ে রইলো ঘসেটি। মহিমাপুরে গদীতে বসে ঘটনার দিকে নজর রেখেছে মহতাপচাঁদ।

মসনদে বসেই সিরাজ হয়ে উঠেছিলো বেপরোয়া। সিরাজ এমনিতেই ছিলো উদ্ধত প্রকৃতির। নবাবী পেয়ে বেড়ে গেল তার ঔদ্ধত্য। গ্রাহ্য করতো না বিশেষ কাউকে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে কথাও বলতো না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আমীর ওমরাহরা ক্ষুব্ধ হলো তার রূঢ় আচরণে।

নিজের খেয়াল খুসীমত কাজ করেছে সিরাজ। পরিণামের কথা ভাবেনি। অথচ তখনও বাদশাহর কাছ থেকে আসেনি ফরমান পায়নি বাদশাহর স্বীকৃতি। ওদিকে পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গ স্বীকার করেনি সিরাজকে। অথচ সিরাজ নবাবী চালেই অপমান করে চলেছে একাধিক প্রভাবশালী মন্ত্রী ও আমীর ওমরাহকে। মীরজাফর ছিলো প্রধান সেনাপতি। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে তার ভূমিকা ও বীরত্ব প্রশংসনীয়। সেই মীরজাফরের হাত থেকে সেনাপতির দায়িত্বভার তুলে নিয়ে দেওয়া হলো মীরমদনকে। ক্ষুব্ধ হলো মীরজাফর। উন্নীত করা হলো মোহনলালকেও। এবার ক্ষুব্ধ হলো জগৎশেঠ মহতাপচাঁদ। কারণ মোহনলাল জগৎশেঠের মিত্র নয়, শত্রু।

প্রজাদের কাছ থেকে অবিলম্বে তিন কোটি টাকা আদায় করতে আদেশ দিয়েছে সিরাজ। জগৎশেঠ আপত্তি জানিয়েছে। প্রকাশ্য দরবারে সিরাজ অপমান করেছে মহতাপচাঁদকে।* বন্দী হয়েছে মহতাপচাঁদ, যার সম্মান নবাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মীরজাফর সহ কয়েকজন অনুরোধ জানালো মহতাপচাঁদকে ছেড়ে

* Longs Records Page 77 এ সিরাজ মহতাপচাঁদকে প্রকাশ্য দরবারে চপেটাঘাত করে বলে উল্লেখ আছে।

দিতে। সিরাজ অটল। শেষ পর্য্যন্ত মীরজাফর প্রমুখ একাধিক সেনাপতি সোজাসুজি জানিয়ে দিলো—তাদের অনুরোধ না রাখলে তারা নবাবের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবে না। এবার হস্তক্ষেপ করলো আলীবর্দ্দি বেগম সরিফন্নেসা। ছাড়া পেলো জগৎশেঠ।

সিরাজ ভুলে যায়নি আলীবর্দ্দির উপদেশ। ইংরেজদের দমন করার উপদেশ। সিরাজের ধারণা হয়েছিলো—কাশিমবাজার কুঠীটা ঠিক ব্যবসার কেন্দ্র নয়, আসলে ইংরেজদের দুর্গ। ওঁৎ পেতে বসে আছে ওরা। সুযোগ পেলেই থাবা বসাবে। সিরাজ আরো মনে করতো ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজস আছে ঘসেটির আর তার দেওয়ান রাজবল্লভের।

তাই সিরাজ যখন জানতে পারলো যে রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস ইংরেজদের আশ্রয়ে, তখন লোক পাঠালো কলকাতায় ড্রেক সায়েবের কাছে। নবাবের আদেশ—কৃষ্ণদাসকে তুলে দিতে হবে নবাবের হাতে। কিন্তু কলকাতা থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এলো নবাবের লোক। ইংরেজরা অগ্রাহ্য করেছে নবাবের আদেশ।

ধৈর্য্য রাখতে পারেনি সিরাজ। ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে সে রাজী নয়। কাশিমবাজার কুঠী অবরোধ করে বন্দী করলো সপরিবার ওয়াটস সায়েবকে। তারপরেই কলকাতা আক্রমণ। কয়েক-দিন যুদ্ধের পর ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলো। প্রাণভয়ে কেউ কেউ পালিয়েছে। অবশিষ্টরা হয়েছে বন্দী নবাবের হাতে। বন্দী ইংরেজদের রাখা হয়েছিল ইংরেজ ব্যবহৃত একটি কারাগৃহে। এদের মধ্যে কয়েকজন মারা যায়। এই ঘটনাকেই 'অন্ধকূপ হত্যা' বলে ইতিহাসে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে।*

---

*অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যে সত্য নয় এ কথা প্রমাণ করেছেন সর্ব্বপ্রথম শ্রীবিহারী লাল সরকার, পরে শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্র।

কলকাতা জয় সম্পূর্ণ করে সিরাজ ফিরেছে রাজধানী মুর্শিদাবাদে এতটা আশা করেনি ইংরেজ। কলকাতা আক্রমণের আগে সিরাজে নিষেধ করেছে আমিনা, নিষেধ করেছে আরও অনেকে। কিন্তু সিরা শোনেনি কারো কথা। বাংলার নবাব সে, ইংরেজ তার প্রজা প্রজার ঔদ্ধত্য সহ্য করবে না নবাব। ইংরেজ বুঝুক নবাবের শক্তি।

বন্দী ওয়াটসের স্ত্রী পুত্রকে ছেড়ে দিতে লুৎফা অনুরোধ করে সিরাজের কাছে। সিরাজ রাজী হয়নি। পরে আমিনা ও লুৎ যুক্তি করে মিসেস ওয়াটসকে পুত্র কন্যা সহ সিরাজের অগোচরে গোপ নদী পথে পাঠিয়ে দেয় চন্দননগরে। আরও কিছুদিন পর সিরা মুক্তি দেয় ওয়াটসকে।

মুর্শিদাবাদে ফিরেও শান্তি নেই সিরাজের। পূর্ণিয়ার শওকতজ খুবই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। বাদশাহর সনদ হাতে পেয়ে নিজে সে সুবা বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করেছে। সিরাজের ম শওকতজঙ্গই এখন মুল প্রতিদ্বন্দ্বী। পথের কাঁটা সরাতে দৃঢ়প্রতি সিরাজ।

রওনা হলো পূর্ণিয়ার দিকে। ঘোরতর যুদ্ধে নিহত হ শওকতজঙ্গ। পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলেছে সিরাজ। সুস্থ ম রাজধানীতে ফিরে এসেছে নবাব।

এদিকে কলকাতায় ইংরেজদের বিপর্য্যয়ের খবর পেয়েই মাদ্রা থেকে ছুটে এসেছে অ্যাডমিরাল ওয়াটস আর কর্ণেল ক্লাইব। কলকা রক্ষার ভার তখন দেওয়ান মাণিকচাঁদের ওপর। কিন্তু মাণিকচ চুপচাপ। তার আচরণ তখন ইংরেজের সঙ্গে প্রায় মিত্রের মতোই খবর পেয়ে সিরাজ ছুটেছে কলকাতায়। কিন্তু রণকৌশলে এব পরাজিত হয় নবাব। কলকাতা পুনরুদ্ধার করে ইংরেজ। ১৭৫৭ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারী বাধ্য হয়েই এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে সিরাজ। সন্ধি

সর্ত্ত অনুসারে স্থির হয়— নবাব ইংরেজদের প্রতি কোনরকম অত্যাচার করবে না এবং ক্ষতিপূরণ দেবে। আর ইংরেজরা শান্তভাবেই ব্যবসা করবে, নবাবের রাজ্যে করবে না কোন গোলমাল।

এদিকে কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে গোপনে। প্রাথমিক কথা-বার্ত্তা চলেছে। ঘটনার দিকে সবাই নজর রাখছে।

ফরাসীদের সঙ্গে নবাবের যোগাযোগটা ভালো চোখে দেখতো না কোম্পানী। ক্লাইব বুঝেছিলো—ফরাসীরা নবাবের একটা খুঁটি। ইতি-মধ্যে বিলেত থেকে খবর এসেছে—যুদ্ধ বেধে গেছে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের। এই ছুতোয় ক্লাইব আক্রমণ করলো চন্দন নগর। সিরাজ নিষেধ করেছে। শোনেনি ইংরেজ। সিরাজ সৈন্যসহ দুর্লভরামকে পাঠায় হুগলীতে। হুগলীর ফৌজদার তখন নন্দকুমার। সিরাজ নন্দকুমারকে নির্দ্দেশ দেয় ফরাসীদের সাহায্য করতে। চতুর ইংরেজ আগে থেকেই নন্দকুমারকে হাত করে দখল করে নেয় চন্দন নগর।* নন্দকুমার সাহায্য করেনি ফরাসীদের। ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে দুর্লভরামকে। শেষ পর্য্যন্ত সিরাজের নির্দ্দেশে দুর্লভরাম সসৈন্যে অবস্থান করে পলাশীতে।

নেপথ্যে চলেছে গভীর ষড়যন্ত্র। এক জায়গায় মিলেছে সব ঘুঘু। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ। ইয়ার লতিফ নবাবের সেনাপতি। গোপনে নিয়মিত টাকা পায় জগৎশেঠের কাছ থেকে। সর্ত্ত আছে—ইয়ার লতিফ তার বাহিনী নিয়ে রক্ষা করবে মহিমাপুরের স্বার্থ।

* নন্দকুমার কি কারণে ফরাসীদের সাহায্য করেনি তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। ঐতিহাসিক অর্ম্মে বলেছে—ইংরেজরা এ সময় আমীরচাঁদ মারফৎ নন্দকুমারকে বারো হাজার টাকা ঘুষ দেয়। Orme's INDOSTAN vol. II

প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরবে নবাবের বিরুদ্ধেও। উমিচাঁদ পাঞ্জাবী মহাজন। জগৎশেঠের দালাল। সিরাজের কলকাতা জয়ের সময় তার ক্ষতি হয়েছে অনেক। শোক ভুলতে না পেরে এসে যোগ দিয়েছে ষড়যন্ত্রের আখড়ায়। এসেছে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তার বুদ্ধি অসাধারণ। এ রকম গভীর ষড়যন্ত্রে একজন দক্ষ বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন আছে বৈকি!

পরপর কয়েকদিন বৈঠক হলো জগৎশেঠের বাড়ীতে। স্থির হলো ইংরেজদের সহায়তায় গদীচ্যুত করা হবে সিরাজকে। মসনদে বসবে মীরজাফর। তারপর ভাগ হবে সিরাজের ধনদৌলত। কে কত ভাগ পাবে তাও মোটামুটিভাবে স্থির করা হলো। কেউ যাতে বেইমানী করতে না পারে তার জন্যে তৈরী হলো দলিল। সব ব্যবস্থা পাকা। শুধু বাকী থাকলো একটা কাজ। ইংরেজদের অনুমোদন আর সহায়তা।

গোপনে খবর পাঠানো হলো কাশিমবাজার কুঠীতে। সেখান থেকে খবর গেল কলকাতায়। বিচার বিবেচনা করে ক্লাইব বুঝলো মহাসুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ না নেওয়ার অর্থ—চরম মূর্খামি।

রাতের অন্ধকারে পর্দানশীন মহিলার ছদ্মবেশে পালকিতে চড়ে ওয়াটস সায়েব এলো জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে। গোপনে চুক্তি হলো মীরজাফর আর ইংরেজদের মধ্যে। মীরজাফর একহাতে কোরাণ আর অন্য হাত দিয়ে মীরণের মাথা স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিলো—ইংরেজদের সব রকম সাহায্য করার। প্রত্যুত্তরে ওয়াটসের অঙ্গীকার—মীরজাফর-কেই নবাব করা হবে। গোপন বৈঠক সেরে খুশী মনে বেরিয়ে এলো ওয়াটস। তারিখটা ছিলো ৫ই জুন ১৭৫৭ সাল। মীরজাফরের সই করা চুক্তিপত্র পাঠানো হলো কলকাতায়। আশ্বস্ত হলো ক্লাইব।

এবার খেলা শুরু হবে তার। মনে মনে ছকটাও তৈরী করে রেখেছে সে।

ক্লাইব চিঠি লিখে নবাবকে জানালো যে নবাব কলকাতার সন্ধি মানছে না ফলে ইংরেজদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই ক্লাইবকে যেতে হচ্ছে কাশিমবাজার। নবাবের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করে কথা বলতে চায় ক্লাইব। ১৪ই জুন সসৈন্যে ক্লাইব রওনা হলো কলকাতা থেকে। চিঠি পেয়ে সিরাজ এবার বুঝতে পারে ইংরেজদের দুরভিসন্ধি।

ইংরেজ সৈন্য ১৬ই জুন পাটুলীতে পৌঁছে, পরদিন ১৭ই জুন কাটোয়া অধিকার করে। কাটোয়ায় থেকে যায় ২২শে জুন পর্য্যন্ত। এখানেই স্থির করা হয়—পলাশীতে নবাবকে আক্রমণ করা হবে।

ওদিকে নবাবও তৈরী হয় ইংরেজদের বাধা দিতে। মীরজাফরের হাব ভাব বেশ সন্দেহজনক। খানিকটা আঁচ করেছে সিরাজ। প্রকাশ করেনি কিছু। মহিমাপুরে গদীতে বসে ব্যবসা করছে জগৎশেঠ। গদীতে বসেই খবরাখবর পাচ্ছে। কে বলবে সে ষড়যন্ত্রকারী? দক্ষ অভিনেতা জগৎশেঠ!

সিরাজ পলাশীতে পৌঁছায় ২২শে জুন। ঠিক বারো ঘণ্টা পরে ঐ তারিখেই রাত্রে ইংরেজ সৈন্যও পৌঁছায় পলাশীতে। আস্তানা করে আম্রকুঞ্জে।

নবাব পক্ষে পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক, পনের হাজার অশ্বারোহী আর তিপান্নটা কামান। ইংরেজ পক্ষে ন'শো ইউরোপীয় সৈন্য, একশো তোপাসী আর একুশশো সিপাই।

আম্রকুঞ্জের সোজাসুজি পুকুরের ধারে নবাব সৈন্যের পুরোভাগে থাকলো ফরাসী গোলন্দাজ-সেনাপতি সিনফ্রের অধীন গোলন্দাজ বাহিনী। পিছনে মীরমদন, তারও পিছনে মোহনলাল। দক্ষিণে পাশা-

পাশি সৈন্যে দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ আর মীরজাফর। অপরদিকে আম্রকুঞ্জের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ সেনা।

২৩শে জুন ১৭৫৭ সাল। সকাল আটটায় নবাব পক্ষে গোলন্দাজ সিনফ্রে প্রথম গোলাবর্ষণের আদেশ দেয়। ইংরেজরাও পালটা উত্তর দেয়। গোলার জবাবে গোলা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে উভয়পক্ষে গোলাবৃষ্টি।

নবাবের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে ক্লাইব আতঙ্কিত। এই বিশাল সমরবাহিনীর সঙ্গে এত অল্প সৈন্য নিয়ে কিভাবে লড়াই করবে বুঝে উঠতে পারে না ক্লাইব। যার ওপর ভরসা করে যুদ্ধে নেমেছে ইংরেজ, সেই পরম বন্ধু মীরজাফরকে গত কয়েকদিন একাধিক চিঠি দিয়ে জবাব না পাওয়ায় ক্লাইব খুবই চিন্তিত। মীরজাফরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে নবাবের চর। দৃষ্টি রেখেছে স্বয়ং নবাব। বেচারা মীরজাফরের বড় অস্বস্তি! ইচ্ছে থাকলেও চিঠির উত্তর দিতে পারছে না, পারছে না কোন সংবাদ পাঠাতে বন্ধু ক্লাইবের কাছে। মসনদ বোধ হয় স্বপ্নই থেকে গেল এ জীবনে! মনের দুঃখ মনের মধ্যেই চেপে রাখে মীরজাফর। ওদিকে বন্ধুর কাছ থেকে সাড়া শব্দ না পেয়ে বন্ধুর শপথের ওপর আস্থা দ্রুত কমে আসছে ক্লাইবের। ঘনীভূত হচ্ছে সন্দেহ। বেড়ে চলেছে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক।

নবাব সৈন্যের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে পিছু হটছে ইংরেজ সেনা। এই সময় হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় নবাবের অনেক গোলা বারুদ ভিজে যায়। তবুও ইংরেজ সৈন্যদের পিছু হটতে দেখে, মীরমদন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে ছুটে যায় ইংরেজ শিবিরে। ইংরেজ সৈন্যের আকস্মিক আঘাতে নিহত হয় মীরমদন। এই ঘটনায় ভীত হয়ে পড়ে নবাব সৈন্য।[ক] এবার সৈন্য বাহিনীকে

ক কেউ কেউ বলেছে—মীরমদনের মৃত্যুই পলাশী যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ।

"One of great causes of our success was that in the very beginning of the action, we had the good fortune to kill Meer Modun, one of the Subah's best and most faithful officers"—Parker.

উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসে মোহনলাল। সসৈন্যে নিজেই এগিয়ে যায় ইংরেজ সেনাকে চরম আঘাত হানতে। মীরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ নিজেও বিহ্বল। মীরজাফরকে অনুরোধ করেছে—এই দুঃসময়ে-নবাবকে সাহায্য করতে। মীরজাফর পরামর্শ দিয়েছে আজকের মতো যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। মীরজাফরের পরামর্শেই সিরাজ ফিরে আসতে নির্দ্দেশ দিয়েছে মোহনলালকে। নির্দ্দেশ পেয়ে বিস্মিত হয় মোহনলাল। নবাবকে বোঝাতে চেষ্টা করে—এই সুযোগে আক্রমণ না করলে যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। দুর্ভাগ্য মোহনলালের। মীরজাফরের পরামর্শই মেনে নেয় নবাব। আক্রমণ না করতে মোহনলালকে নির্দ্দেশ দেয় সিরাজ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসতে বাধ্য হয় মোহনলাল।

এই সুযোগে মীরজাফর খবর পাঠায় বন্ধু ক্লাইবের কাছে ইংরেজ শিবিরে। আশ্বস্ত হয় ক্লাইব। নবাব সৈন্য ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অতর্কিতে নবাব সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংরেজ বাহিনী। পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নবাবের বিশ্বাসঘাতক তিন সেনাপতি—মীরজাফর. দুর্লভরাম আর ইয়ার লতিফ বিন্দুমাত্র বাধা দেয়নি তারা। বিকেল পাঁচটায় যুদ্ধ শেষ। ইংরেজ সৈন্য দখল করে নিয়েছে নবাবের শিবির। ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছে অসীম বীরত্বে। কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি তারা। বাধ্য হয়েছে পিছু হঠতে। পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ হয়েছে এটুকুই। নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেছে মীরমদন, করতে চেয়েছিলো মোহনলাল, আর শেষ পর্য্যন্ত লড়েছে সিনফ্রে—একজন ফরাসী।

সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে পালিয়ে গেছে কাপুরুষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং নবাব তার পরাজয়ের বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম বয়ে নিয়ে এসেছে রাজধানীতে।

ইচ্ছে করতো তাহলে শুধু লাঠি আর ইঁট দিয়ে তারা ধ্বংস করতে পারতো ইংরেজদেরকে।

হয়তো সত্যিই তা পারতো। কিন্তু হয়নি। কারণ, দেশের লোকেদের মধ্যে ছিল না রাজনৈতিক চেতনা। স্বাধীনতা আর পরাধীনতার অর্থ সাধারণ লোক জানতো না। জানতো না এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ। দেশকে তথা প্রজাবর্গকে চালনা করতো শেঠ, রাজা, মহারাজা আর খান সায়েব নামধারী কিছু প্রভাবশালী লোক। এরাই ছিলো দেশের মুখপাত্র। এদের মতামতই ছিল চূড়ান্ত। অন্ততঃ সে সময় দেশের লোক তাই মনে করতো।

মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেই ক্লাইব প্রথমে যায় মোরাদবাগ প্রাসাদে। সেখান থেকে মীরণ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসে হীরাঝিল প্রাসাদে। সেখানে পলাশীর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক নায়ক সহ আরও বহু বিশিষ্ট লোকের উপস্থিতিতে ক্লাইব স্বয়ং মীরজাফরের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মসনদে বসায়। তারপর মীরজাফরকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানান হয়। যে সব রথী মহারথী সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও একে একে এগিয়ে এসে নতুন নবাবকে স্বাগত জানায়; সামরিক সঙ্গীত এবং তোপধ্বনি মারফৎ মীরজাফরের মসনদে বসার সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণকে।*

অনুষ্ঠান শেষে লুঠ করা হয় সিরাজের প্রকাশ্য ধনাগারের ধনরত্ন। লুঠের সময় উপস্থিত ছিল নবাব মীরজাফর, ক্লাইব, ওয়ালস্, কাশিম-

* At one end of the hall, was placed the Musnud of Serajuddula, which Mirzafar appearing to avoid, Colonel Clive took him by the hand, and leading him to it, seated him thereon. He then presented him with a salver of gold Mohurs and congratulated him on his accession to the Musnad of Bengal, Bihar and Orrisa. This example was followed by all the persons present and the event was announced to the public by the discharge of canon and the sounds of Martial Music.—Stewart—History of Bengal,

বাজার কুঠীর ওয়াটস, লুসিংটন্, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুনসী নবকৃষ্ণ। প্রকাশ্য ধনাগারে ছিল—এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রূপোর টাকা, বত্রিশ লক্ষ সোনার টাকা, তুটো সিন্দুক বোঝাই সোনা, চার বাকসো হীরা জহরৎ আর তু'বাকসো চুনী পান্না এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্ন।

মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা পায় মোট তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা। এর মধ্যে স্বয়ং ক্লাইব পায় তেইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা।

টাকা ভাগাভাগির আলোচনাটা হয়েছিলো শেঠ বাড়ীতে। ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল, সেই মতো টাকা প্রকাশ্য ধনাগারে নাই। অনেক আলাপ আলোচনা তথা তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয় ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা ইংরেজদের দেওয়া হবে তুটো কিস্তিতে। আপাততঃ অর্দ্ধেক, পরে বাকী অর্দ্ধেক। এতেই ইংরেজরা রাজী হয়।

কে কত টাকা পাবে এটা স্থির করা ছিল গোপন দলিলে পলাশীর যুদ্ধের আগেই। ক্লাইবের নির্দ্দেশে তুটো দলিল তৈরী হয়। একটা আসল, অপরটা জাল। জাল দলিলে একটা সর্ত্ত ছিল—উমিচাঁদ'কে দেওয়া হবে কুড়ি লক্ষ সিক্কা টাকা। হিসাব নিকাশের পর উমিচাঁদ জানতে পারে জাল দলিলের কথা। এক পয়সাও পায়নি উমিচাঁদ। এই একটি মাত্র লোক হাতে নাতে ফল পেয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার। জাল দলিলের খবর শুনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। অনুচররা তাকে ঐ অবস্থায় বাড়ী পৌঁছে দেয়। পরে সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাকী জীবনটা কাটায়। বেচারা উমিচাঁদ!

এদিকে পালাবার পথে রাজমহলের কাছে ধরা পড়ে সিরাজ। তিন দিন প্রায় অনাহারের পর কিছু খাবার জোগাড় করার জন্যে নৌকা দাঁড়ায় গ্রামের কিনারে। দানশাহ নামে জনৈক ফকীর

সিরাজের পায়ের নাগড়া দেখে সন্দেহ করে। খবর দেয় যথাস্থানে। দ্রুত মীরকাশেম এসে বন্দী করে সিরাজকে। লুঠ করে নেয় লুৎফার যাবতীয় অলঙ্কার, টাকা পয়সা সব। বন্দী সিরাজকে লুৎফাসহ পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদে।

মীরণ দেরী করতে রাজী নয় দরবারের হালচাল বোঝা বড়ই কঠিন। কে মিত্র কে শত্রু সব জানা যায় না। আজকের মিত্র আগামীকাল হয়ে উঠেছে প্রধান শত্রু। তাছাড়া মানুষের মন তো! আজ সিরাজ বন্দী কারও অনুরোধে বা চাপে পড়ে যদি নবাবের মন নরম হয়, অথবা যদি কেউ টাকা পয়সা হীরে জহরতের বিনিময়ে গলিয়ে দেয় ক্লাইব সায়েবের আক্রোশের উত্তাপ। তাহলে হয়তো কালই ছাড়া পেতে পারে সিরাজ। এমন কি বিদ্রোহ হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজেই দেরী করতে চায় না মীরণ। খতম করে দিতেই হবে ভবিষ্যতের আশঙ্কা আর দুর্ভাবনার মূল।

কিন্তু খতম করবে কে? রাজী হচ্ছে না কেউ। একে একে সবাই অক্ষমতা জানায়। শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় একজনকে। নাম—মহম্মদী বেগ। তাকে মানুষ করেছিলো সিরাজের বাবা জৈনুদ্দিন আর দাদু আলীবর্দ্দি। ঘৃণিত কাজ করতে রাজী হয় মহম্মদী বেগ। মুল নায়কের অনুমতি মিলেছে। মীরণের আদেশে মহম্মদী বেগ জাফরগঞ্জ প্রাসাদের একটা ঘরে নৃশংসভাবে হত্যা করে সিরাজকে। হোসেন কুলী আর তার অন্ধ ভাই হায়দারের হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করলো সিরাজ নিজের জীবন দিয়ে।

শেষ হয়ে গেল আরও একটা অধ্যায়। সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়। আলীবর্দ্দির বংশের ছেদ পড়লো ইতিহাসে।

সিরাজের রক্তাক্ত মৃতদেহ হাতীর পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজপথ দিয়ে। খবর পেয়ে প্রাসাদের চিরাচরিত রীতি অগ্রাহ্য

করে মর্ম্মাহত আমিনা ছুটে আসে প্রকাশ্য রাস্তায়। ছেলের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। শোকে আছড়ে পড়ে রাস্তায়। নবাবের কয়েকজন অনুচর জোর করে আমিনাকে টেনে নিয়ে পাঠিয়ে দেয় প্রাসাদের ভেতরে। আলিবর্দ্দির মেয়ের গায়ে হাত দিলো বাইরের লোক। প্রহরীরা নির্ব্বাক দর্শকমাত্র। প্রাসাদেও নেই কোন প্রতিক্রিয়া!

সিরাজকে সমাধিস্থ করা হলো খোসবাগে। দাদু আলীবর্দ্দির পাশেই। আলীবর্দ্দি বেগম, ঘসেটি, আমিনা, আর লুৎফাকে পাঠানো হলো ঢাকায়। পরে অনেক শলাপরামর্শ করে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনার ছল করে, মীরনের আদেশে মাঝপথে নদীতে ডুবিয়ে মারা হলো ঘসেটি আর আমিনাকে। মরবার আগের মুহূর্ত্তে আমিনা অভিশাপ দেয় মীরনকে—বজ্রাঘাতে তোর মৃত্যু হোক্।

একে একে সবাইকে সুপরিকল্পিত ভাবে শেষ করেছে মীরন। আলীবর্দ্দির বংশের প্রায় সকলেই শেষ। মসনদ নিষ্কণ্টক। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ নেই। বেঁচে আছে একজন—লুৎফা। সে তো সামান্য একজন নারী। একমাত্র লুৎফাকেই নিয়ে আসা হলো মুর্শিদাবাদে। বাকী জীবনটা লুৎফা কাটিয়ে দিয়েছে খোসবাগে। সিরাজের সমাধি ভবনে।

মসনদে বসে শান্তি পায়নি মীরজাফর। নামেই সে নবাব। প্রকৃতপক্ষে ক্লাইবের হাতের পুতুল। ক্লাইব যা বলে, মীরজাফর তাই করে। নিজের কোন ক্ষমতাই নেই। যেন সাজানো ভাঁড় বিশেষ। তাই মীরজাফরের নতুন নাম হয়েছে—'ক্লাইবের গর্দ্দভ'।

শাসন কাজ চালায় মীরন। কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ইংরেজ। তারা ব্যবসা করতে এসেছে, এসেছে এদেশ থেকে রোজগার করতে।

তারা সিরাজকে নামিয়ে মীরজাফরকে বসিয়েছে। তাদের দয়াতেই মসনদে বসেছে মীরজাফর। এ সত্য ভোলেনি ইংরেজ। ভোলেনি মীরজাফরও। তাই সহ্য করেছে সব। কিন্তু ইংরেজের চাহিদাটা বড় বেশী। যত দিন যায়, ততোই চাহিদা বাড়ে। গদীতে বসার জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে মীরজাফর। রাজকোষ শূন্য। খাজনা আদায় নেই। জগৎশেঠও হাত গুটিয়ে নিচ্ছে ক্রমশই। সৈন্যদের মাইনে বাকী। অথচ বাকী টাকার জন্য ইংরেজ তাগাদা দিচ্ছে বারবার। মহাচিন্তায় পড়েছে মীরজাফর।

এই সময় আবার জগৎশেঠ হঠাৎ রওনা হলো তীর্থ করতে। নবাবের চেয়ে তার সম্মানও কম নয়। তাই সঙ্গে গেল হাজার দু'য়েক সৈন্য। খবরটা শুনেই খট্‌কা লেগেছে মীরজাফরের। জগৎশেঠের আচরণ কেমন যেন সন্দেহজনক। সৈন্য পাঠালো নবাব। জগৎশেঠকে ফিরিয়ে আনতে হবে মুর্শিদাবাদে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! নবাবের সৈন্যরা জগৎশেঠকে ফিরিয়ে না এনে তার সঙ্গেই চললো তীর্থ করতে।

সংবাদ পেয়ে ঠোঁট কামড়েছে মীরজাফর। বুঝতে চেষ্টা করেছে নবাব কে? সে না জগৎশেঠ? পরে বুঝেছে টাকা যার, ক্ষমতা তারই।

শাহ-আলম আসছে বাংলা আক্রমণ করতে। মীরজাফর প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ। ক্ষমতা নেই তার বাধা দেওয়ার। কোম্পানীর গোরা সৈন্য তাড়িয়ে দিলো শাহ-আলমকে পাটনা থেকেই। মান বাঁচলো মীরজাফরের। কিন্তু একটা দারুণ দুর্ঘটনাও ঘটলো। ঐ পাটনাতেই যুদ্ধ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা গেল মীরন। আমিনা বেগমের অভিশাপই বুঝি সত্যি হলো!

মীরনের মৃত্যুতে মীরজাফর দিশেহারা। কি করবে ভেবে পায় না নবাব। পলাশী যুদ্ধের সময় যারা একসঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র করেছিলো সিরাজের বিরুদ্ধে, আজ আর তাদের মধ্যে একতা নেই। অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। সংশয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের মুখে

চোখে। সন্দেহ করছে একে অপরকে। সর্ব্বত্রই অবিশ্বাসের ছায়া। যোগসূত্র রচনা করে নবাবকে টিকিয়ে রেখেছে ক্লাইব। তার দয়াতেই মীরজাফর তখনও নবাব। হঠাৎ ক্লাইব সায়েব চলে গেল বিলেতে। যাবার আগে কোম্পানীকে অনুরোধ করে গেল—নবাব আর জগৎশেঠের স্বার্থ রক্ষা করতে। অকৃতজ্ঞ নয় ক্লাইব! এলো নতুন সাহেব ভ্যান্সিট্টার্ট। হলওয়েল সায়েব তো আছেই। আর আছে রেসিডেন্ট হেষ্টিংস।

টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক। ক্লাইব বড়লোক হয়েছে মুর্শিদাবাদের দৌলতে। অন্যরাই বা বাদ যায় কেন? তারাও হতে চায় ধনী। তারা এসেছে টাকা লুঠতে। এতে কার কি ক্ষতি হলো, কে মরলো কে বাঁচলো—হিসেব করার প্রয়োজন নেই। তাই গোপনে শুরু হয়েছে আবার ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র সফল হলেই টাকা আসবে। এ সত্যটা বুঝে নিয়েছে ইংরেজ সেই পলাশী যুদ্ধের সময় থেকেই। নবাব তো এখন কেউ নয়। ক্ষমতা যা কিছু কোম্পানীর। তাই কোম্পানীর সঙ্গে গোপন বৈঠক হলো মীরজাফরের জামাই মীরকাশেমের। কাঁটা দিয়ে কাঁটা সরাতে হয়। মীরকাশেম নবাব হলে, কে কত টাকা পাবে সেই বিষয়ের মীমাংসা হলো সর্ব্বাগ্রে। অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হলো কাকে কত দেওয়া হবে :—

গভর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট	—	৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড	
হলওয়েল	—	৩০,৯৩৭	
সমর	—	২৮,০০০	
কেইলাউড	—	২২,৯১৬	
ম্যাকগোয়ার	—	২০,৬২৫	,,
মেজর ইয়র্ক	—	১৫,৩৫৪	,,
		১৫,৩৫৪	,,
ম্যাকওয়ার	—	৮,৭৫০	
	মোট	২,০০,২৬৯ পাউণ্ড	

সবচেয়ে বড় অঙ্কটা রাখতে হয়েছে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সায়েবের জন্যে। এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত তো! ঝড়ঝাপটা আছে, আছে কত রকমের ঝক্কি। সবই তো তখন সামলাতে হবে তাকেই। তাই বরাদ্দটা তার দিকে বেশী রাখতেই হবে। দায়িত্ব বেশী, খরচাও বেশী। খুশী হয় ভ্যান্সিটার্ট। খুশী অন্য সদস্যরাও। তাদের ভাগটাও তো কম নয়। পাকাপাকি ভাবে চুক্তি হয়ে গেল। হীরাঝিল প্রাসাদে বসে কিছুই জানতে পারলো না মীরজাফর। এবার কিন্তু এই ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকলো জগৎশেঠ।

হঠাৎ একদিন মীরকাশেমের সৈন্যরা অবরোধ করলো নবাব প্রাসাদ। এগিয়ে এলো না কেউ নবাবের সাহায্যে। গুরুদেব ক্লাইব বিলেতে। ভ্যান্সিটার্ট নির্ব্বাক। মীরজাফর বুঝলো সব। করার কিছুই নেই। তাই মেনে নিলো ভাগ্যকে। গদীচ্যুত হলো মীরজাফর। প্রিয়তমা মণিবেগমকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো প্রাসাদ ছেড়ে। চলে গেল সোজা কোলকাতায়।

মসনদে বসলো মীরকাশেম। শ্বশুড়কে তাড়িয়ে দিয়ে বসলো জামাই।

মীরকাশেম চতুর, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীনচেতা নবাব। সে জানতো নবাব হলেও ক্ষমতা থাকবে না তার হাতে। ক্ষমতা কোম্পানীর। কারণ কোম্পানীই নবাব করেছে মীরকাশেমকে। প্রয়োজনে আবার তাকে নামিয়ে করবে হয়তো অন্য কাউকে। যেমন মীরজাফরকে গদীতে বসিয়েছিলো ইংরেজ, আবার নামিয়েও দিয়েছে সেই ইংরেজ। তাই মীরকাশেম চেষ্টা করেছে ইংরেজের প্রভাব খর্ব্ব করতে। তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে এবং মসনদকে মুক্ত রাখতে।

মীরকাশেম জানে শেঠবাড়ীর প্রভাব। মহিমাপুরের অদৃশ্য সঙ্কেতে ভোজবাজীর মতোই ওলট পালট হয়ে গেছে নবাবের মসনদ।

তাদের প্রভাব অতুলনীয় এবং আজও অপ্রতিহত। শেঠদের সঙ্গে আবার ইংরেজদের ভাব গলায় গলায়। শেঠদের আছে টাকা। ইংরেজের আছে বাহুবল। এই দুই শক্তির যোগফল তাই মারাত্মক। এই সত্য জানে মীরকাশেম। অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই সে চেষ্টা করেছে এদের প্রভাব খর্ব্ব করতে। মসনদকে স্বাধীন রাখতে।

মসনদে বসেই সমস্যা। রাজকোষ শূন্য। সৈন্য সামন্তদের মাইনে বাকী অনেকদিন। প্রজাদের অবস্থাও সঙ্গীন। এদিকে চুক্তির টাকা মিটিয়ে দিতে ইংরেজের উপর্য্যুপরি তাগাদা। ওদিকে শাহজাদা ওঁৎ পেতে বসে আছে।

কিছু টাকা দিয়েছে শেঠ বাড়ী। জগৎশেঠের হাত এখন আর দরাজ নয়। নতুন কর বসিয়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হলো। ইংরেজদের টাকার চাহিদা মিটাতে খেসারত দিতে হয়েছে সাধারণ প্রজাকে। সেকালে কর বৃদ্ধি করে কিভাবে বার্ষিক রাজস্ব বাড়ানো হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে নীচের তালিকায় :—

১। টোডরমল্লর আসল জমা তুমারি রখবা

(ক)	দিল্লীর রাজকোষে পাঠানো হতো	৬৭,৯৮,৩৮৬ টাকা
(খ)	নাজিম ও মনসবদার বাবদ	২৫,১৮,০৬৯ ,,
(গ)	বকসীর জায়গীর বাবদ	১,১৫,০৯১ ,,
(ঘ)	দেওয়ানের জায়গীর বাবদ	৪,৫৭,৬৩৬ ,,
(ঙ)	ফৌজদার থানাদার ইত্যাদি বাবদ	২,৪৮,৮২৩ ,,
		মোট—১,০১,৩৮,০০৫ টাকা

২। আবোয়াব (মূল জমা ছাড়া বাড়তি রাজস্ব)

(চ)	খাসনবিসি. অর্থাৎ বাদশাহর কাছে বাংলা থেকে যে সব মূল্যবান জিনিষ পাঠানো হতো তার ব্যয় বাবদ	২,২২,২৩৩ টাকা

(ছ) চৌথ (মহারাষ্ট্রীয়দেরকে দেওয়ার জন্য নবাব আলীবর্দ্দি খালসা মহলের ওপর টাকা প্রতি যে কর ধার্য্য করে)	১১,০৫,৫১৩ টাকা
(জ) নজরানা মনসুর (মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সিরাজদ্দৌলা যে কর ধার্য্য করে)	৩,৭০,০২৫ ,,
(ঝ) নবাব নাজিমের হাতীশালার খরচ বাবদ	২,১০,৯৩৮ ,,
(ঞ) আবোয়াব ফৌজদারী	৬,০৫,৪৬৮ ,,
(ট) নবাব প্রাসাদ তৈরীর কাজে চূণ সরবরাহ বাবদ কর	১,৫১,৮১৮ ,,
(ঠ) চক চাঁদনী (মুর্শিদাবাদের বাজারের ওপর ধার্য্য কর)	৩,৫৬০ ,,
(ড) স্থায়ী নজরানা (নাজিমকে জমিদারের দেয় নজরানা বাবদ)	৪,৪১,৯৭৭ ,,
(ঢ) জের মাথাট্ (খালসা কর্ম্মচারীদের খরচ বাবদ)	১,০১,৪১৬ ,,
(ণ) গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাথর ইত্যাদি আনা বাবদ	৮,০০০ ,,
(ত) সরাফ (আদায়ের উপর মীরকাশেম টাকা প্রতি যে কর ধার্য্য করে)	৪,৫৩,৪৪৮ ,,
	মোট—৩৬,৭৪,৪৩৬ টাকা

৩। কিফায়ৎ বা হস্তবুত মুনাফা

রাজস্ব আদায়ের পূর্ব্ব পদ্ধতি বাতিল করে মীরকাশেম নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা হস্তবুত দৃষ্টে যে টাকা আদায় করে   ৪৮,৪৭,২৭৭ টাকা

সর্ব্ব মোট—১,৮৬,৫৯,৭১৮ টাকা*

১১৭২ সনে (কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণের পর) মোট জমা দাঁড়ায় এক কোটি ছিয়াশী লক্ষ উনষাট হাজার সাতশো টাকার ওপর।

এই ভাবে দিনে দিনে কর বৃদ্ধি হয়েছে আর তার মাশুল গুনেছে সাধারণ প্রজা। জমিদারদের নাভিশ্বাস উঠেছে। মীরকাশেম কর বাড়ানোর প্রস্তাব করলে প্রতিবাদ জানিয়েছে জগৎশেঠ। গ্রাহ্য করেনি নবাব। কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে থাকতে রাজী নয় সে। যে কোন ভাবেই হোক কোম্পানীর প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত হতেই হবে। খরচ সংক্ষেপ করা হলো। ছাঁটাই হলো বহু কর্ম্মচারী। বিলাসিতা সম্পূর্ণ বন্ধ। নবাব যেন বেপরোয়া।

যে কথা সেই কাজ। জোর জবরদস্তিতে টাকা আদায় হলো। রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক। কোম্পানীর সব পাওনা মিটিয়ে দিলো নবাব।

মীরকাশেম মসনদে বসার পরই, কলকাতার টাকশাল সব রকম সুযোগ সুবিধে আদায় করে নিয়েছে নবাবের কাছ থেকে। কোম্পানীর দীর্ঘ-দিনের চেষ্টা সফল হয়েছে। গুরুত্ব কমে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের টাকশালের।

মীরকাশেম বুঝেছে যে মুর্শিদাবাদে থেকে ইংরেজের প্রভাব এড়ানো শক্ত। মুর্শিদাবাদের দরবারে ইংরেজের অবাধ যাতায়াত। পাশেই কাশিমবাজার কুঠী। গোপনীয়তা থাকে না। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই। কার ভূমিকা কখন কি হবে আন্দাজ করা যায় না। অভিজ্ঞতা থেকেই নবাব অনেক কিছু শিখেছে।

* এখানে শুধু টাকার অঙ্ক দেখানো হয়েছে। আনা, গণ্ডা ও কড়ার হিসাব ধরা হয়নি।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে মীরকাশেম রাজধানী স্থানান্তরিত করেছে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে। তার পরিকল্পনা অনেক। ইংরেজকে কাবু করতে হলে, সুবাকে বাঁচাতে হলে চাই শক্তি। অবশ্যই সামরিক শক্তি নবাবী সেনাকে করতে হবে আরও জোরদার। কারও ওপর নির্ভর করা চলবে না। উৎপাদন করতে হবে সামরিক সরঞ্জাম। তৈরী হয় নবাব।

নবাবের নির্দ্দেশে মুঙ্গেরে গড়ে উঠলো গোলাগুলি, কামান আর বন্দুকের কারখানা। সেনাবাহিনীকে আরও সুশিক্ষিত আরও রনকুশলী করে তোলার ব্যবস্থাও চললো পাশাপাশি। এসব কাজের ভার দেওয়া হলো গ্রেগরী (পরে গর্গিন খাঁ) ও মার্কার নামে দুজন আর্ম্মেনীয় এবং সমরু নামে একজন ইংরেজের ওপর। ইংরেজদের বন্দুকের তুলনায় মুঙ্গেরের কারখানায় তৈরী বন্দুক হলো অনেক মজবুত। একথা স্বীকার করেছে অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক।

কারখানা তৈরীর সব খবরই পেয়েছে ইংরেজ কাউন্সিল। টনক নড়েছে তাদের। তারা বুঝতে পারছে নবাবের উদ্দেশ্য।

মীরকাশেম জানে, জগৎশেঠের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ইংরেজদের আর গদীচ্যুত নবাব মীরজাফরের। জগৎশেঠের প্রভাব তখনও অম্লান। তার আঘাত অব্যর্থ। জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদে থাকলে নিমেষে অঘটন ঘটা সম্ভব। তাই মীরকাশেমের আদেশে নবাবী সৈন্য হঠাৎ একদিন অবরোধ করলো মহিমাপুরের প্রাসাদ। মহতাপচাঁদ আর স্বরূপচাঁদকে সসম্মানে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো মুঙ্গেরে। চোখে চোখে রাখলে আশঙ্কাটা কমবে। খবর শুনে ক্ষুব্ধ হলো ইংরেজ। ক্লাইবের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি তারা। রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে মহিমাপুরের স্বার্থ। ভ্যান্সিট্টার্ট সায়েব নবাবের কাছে চিঠি লিখে দাবী জানালো—অবিলম্বে শেঠদের ছেড়ে দিতে। ইংরেজের দাবী গ্রাহ্য করলো না নবাব।

বেশ কিছুদিন থেকে শুল্ক নিয়ে বিবাদ তো চলছেই ইংরেজদের সঙ্গে। ইদানীং নবাব আদেশ দিয়ে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছে। নবাবের আদেশ—দেশী বিদেশী যে কেউ বিনাশুল্কে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। এই আদেশের ফলে কোম্পানীর স্বার্থ নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একচেটিয়া ব্যবসার সমাধি। চরম আঘাত হেনেছে মীরকাশেম। এ আঘাত হজম করা সম্ভব নয়। বিবাদ উঠেছে চরমে।

ইংরেজ নাছোড়বান্দা। মীরকাশেম সিদ্ধান্তে অটল। মীমাংসার সূত্র নেই। সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কোম্পানীর কর্ত্তারা ভেবেচিন্তে স্থির করলো—মসনদ থেকে সরাতে হবে মীরকাশেমকে। গদীচ্যুত মীরজাফরকেই আবার বসাতে হবে মসনদে।

১৭৬৩ সালের ১৯শে জুলাই। পলাশীর কাছে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয় নবাব সৈন্য। অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মহম্মদ তাকী। চারদিন পরে ইংরেজের দ্বিতীয় আক্রমণে মতিঝিলের কাছে সংগঠিত নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে। ইংরেজ দখল করে নিয়েছে মুর্শিদাবাদ।

২৫শে জুলাই ১৭৬৩ সাল। ইংরেজদের সহযোগিতায় আবার মসনদে বসেছে মীরজাফর। মুর্শিদাবাদের মসনদে একমাত্র মীরজাফর বসেছে দু'বার।

মীরকাশেম তখনও বাংলা ছাড়েনি। তখনও সে হীনবল নয়। ইংরেজকে পাল্টা আঘাত হানতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লড়াই করে সে জিততে চায়। দেখাতে চায় ইংরেজের তুলনায় নবাবের শক্তি কিছু কম নয়। গোপন প্রস্তুতির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে মীরকাশেম প্রতিজ্ঞায় অটল।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে মীরকাশেমের বাহিনী। বিপর্য্যয় রোধ করতে পারেনি সেনাপতি সমরু, মার্কার আর আসাদুল্লা।

গিরিয়ার পর উধুয়ানালা। মীরকাশেমের সবচেয়ে শক্ত এবং সুরক্ষিত ঘাঁটি। সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছে মীরকাশেম। প্রায় ষোল হাজার নতুন সৈন্য পাঠিয়েছে উধুয়ানালায়। সঙ্গে এসেছে সেনাপতি আরাটুন, জাতিতে আর্ম্মেনীয়। সব মিলিয়ে উধুয়ানালায় মীরকাশেমের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় চল্লিশহাজার।

কিন্তু শুধু সৈন্যবলই যুদ্ধজয়ের মাপকাঠি নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন রণকৌশল, কূটবুদ্ধি, সাহসিকতা এবং সতর্কতা। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত। তাই মীরকাশেমের সৈন্যদের অসতর্কতার সুযোগে দুরূহ বাধা অতিক্রম করে অতর্কিতে আক্রমণ করলো ইংরেজ সেনা। বাধা দেওয়ার অবকাশ পায়নি মীরকাশেমের সৈন্য বাহিনী। প্রচুর সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও বিপর্য্যয় রোধ করতে পারেনি নবাবের সুশিক্ষিত সেনাপতিরা।

উধুয়ানালার পরাজয় বাংলার মুসলমান গৌরবের সমাধি।

কেউ কেউ মনে করে—কোন কোন সেনাপতির কূটবুদ্ধির অভাব, কারও বিশ্বাসঘাতকতা আবার কারও কারও সাহসিকতার অভাব এবং সেইসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মীরকাশেমের অনুপস্থিতি—এ সবের যোগফলেই উধুয়ানালার বিপর্য্যয়। বোল্ট সায়েব বলেছে—"......had not his (Mir Cossim's) subordinate commanders proved deficient in personal courage or even had he himself had the bravery to animate his troops properly by his own presence in the field, it is more than probable that, the English company would have been left, from that day withont a single foot of ground in these Provincs."*

* Consideration on Indian Affairs.

উধুয়ানালা থেকে ইংরেজ সৈন্য গিয়েছে মুঙ্গেরে। তার আগেই মুঙ্গের ছেড়ে পালিয়ে গেছে মীরকাশেম। পালাবার আগে চরিতার্থ করে গেছে চরম প্রতিহিংসা। হত্যা করেছে একাধিক নামী এবং দামী বন্দীকে। মুঙ্গের দুর্গের ওপর থেকে গঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে জগৎশেঠ মহতাপচাঁদকে। রেহাই পায়নি মহারাজ স্বরূপচাঁদ। রেহাই পায়নি সপুত্র রাজা রাজবল্লভ, রায় রায়ান উদিম রায় সহ একাধিক রাজা জমিদার। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে একমাত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি ইংরেজ। রক্ষা করতে পারেনি জগৎশেঠকে। যে জগৎশেঠের সহায়তায় ইংরেজ এদেশে এসে মৌরসী-পাট্টা জমিয়ে বসেছে, সেই জগৎশেঠকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে গদীচ্যুত নবাব মীরকাশেম। সাহায্য করতে পারেনি ইংরেজ। অসহায় ভাবে খবর শুনেছে। ইংরেজ অনুতপ্ত।

দ্বিতীয়বার গদীতে বসেছে মীরজাফর। এবার দেওয়ান তার বিশ্বাসভাজন বন্ধু নন্দকুমার। এবারও মসনদে বসার জন্য মোটা টাকা দিতে হয়েছে কাউন্সিলের সদস্যদের। সব মিলিয়ে মোট দেড় কোটি টাকা।* মীরজাফর জানতো নামেই সে নবাব। আসল নবাব কোম্পানী। মীরজাফর কোম্পানীর হাতের পুতুল মাত্র। যে ইংরেজকে সেদিন সে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুযোগ এনে দিয়েছে, সেই ইংরেজের খুঁটি আজ অনেক শক্ত। শিকড় তার ঢুকে গেছে অনেক গভীরে। আজ, ইংরেজ তার প্রভু। নিজের জালেই জড়িয়ে পড়েছে মীরজাফর। খাল কেটে কুমীর আনার বিপদ বুঝেছে নবাব। কিন্তু বুঝেও উপায় নেই। পরিত্রাণের পথ নেই। ভুলের মাশুল দিয়েছে সাধারণ লোক।

* "Meer Jaffier was restored to the Government in 1763; and on this occasion divided amongst the company's servants the sum of 437,499 pounds and 975,000 pounds was received of him as restitution money."
—A short view of the Evidence of our conduct in India.

শোষণে শোষণে বঞ্চিত, নিঃস্ব তারা। বাংলার সোনা লুঠে নিয়ে গেছে ইংরেজ। মুর্শিদাবাদের সম্পদ গিয়েছে ইংলণ্ডে।

তবু মীরজাফর নবাব। হোক না কোম্পানীর পুতুল। নবাব তো বটে। খানা পিনায়, বিলাসিতায়, আরামে, আভিজাত্যে সম্মানে সে—নবাব নাজিম।

গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে এবং কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে মীরজাফর গিয়েছে কলকাতায়। কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছে নবাবকে। চন্দননগরের কাছে গরুটিতে স্বয়ং গভর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট সায়েব মোট উনপঞ্চাশ খানা ময়ুরপঙ্খী বজরা আর নৌকা নিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে মীরজাফরকে।* কোম্পানীর সৈনিকরা নবাবকে উপহার দিয়েছে একান্নখানা মোহর। কলকাত্তাবাসীদের পক্ষ থেকে মেয়র আলিভারম্যান দিয়েছে চল্লিশখানা মোহর। নবাব আর তার সঙ্গপাঙ্গদের কয়েকদিনের খাওয়া বাবদ কোম্পানীর খরচ হয় সাতশোত্রিশ টাকা ছ' আনা মাত্র। এর মধ্যে ছিল চল্লিশ মণ মিহি চাল, আট মণ ময়দা, পাঁচ মণ চিনি, ছ' মণ মিষ্টি, আট মণ দই, এক মণ কিসমিস বাদাম, পাঁচ মণ ঘি, পঞ্চাশটা ছাগল, একমণ মোরব্বা ছাড়াও ডাল, তেল, মশলা, তরিতরকারী ইত্যাদি হরেক জিনিষ।†

অভ্যর্থনা আর সম্বর্দ্ধনায় অভিভূত হয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে মীরজাফর। রাজকোষ শূন্য। সৈন্যদের মাইনে বাকী। দেশের অর্থনীতি

* ঐ সময়ে একখানা আট দাঁড়ের বজরার দৈনিক ভাড়া ছিল দেড় টাকা মাত্র।

† ৪০ মণ মিহি চালের দাম পড়েছিলো পঁচাত্তর টাকা, ৫ মণ ঘি এর দাম সাতাত্তর টাকা, ১ মণ কিসমিস বাদামের দাম একত্রিশ টাকা চার আনা, ৮ মণ দই এর দাম একুশ টাকা চার আনা, ৫০টা ছাগলের দাম পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। আর্থিক ছুরাবস্থা দেখা দিয়েছে ধনকুবের জগৎশেঠের।

মণিবেগমকে নিয়ে দিন কাটিয়েছে মীরজাফর। রাজকার্য্য দেখা-শোনা করেছে দেওয়ান নন্দ কুমার।

কিন্তু শরীরে সহ্য হয়নি নবাবী বেশিদিন। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭৬৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী ৭৪ বছর বয়সে মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের, বহু ষড়যন্ত্রের নায়ক মীরজাফর।

মীরণ মারা গেছে আগেই। তাই মীরজাফরের মৃত্যুর পর সমস্যা দাঁড়ালো কিছুটা। মসনদের দাবীদার দু'জন—একদিকে মীরণের ছেলে অপরদিকে মীরণের সৎ ভাই মণিবেগমের গর্ভজাত নজমুদ্দৌলা। প্রচলিত প্রথা ও নিয়মানুসারে ছেলে জীবিত থাকলে নাতির দাবী গ্রাহ্য হয় না। তদ্বির করেছে মণিবেগম নিজের ছেলের জন্য। মীরণের ছেলের দাবী অগ্রাহ্য করলো কাউন্সিল। মসনদে বসলো নজমুদ্দৌলা। মণিবেগমের আদরের ছেলে। খুশী হয়েছে মণিবেগম। এতদিন ছিল নবাবের বেগম। এখনহলো নবাবের মা। সাধ তার পূর্ণ হয়েছে। কাউন্সিলের সদস্যদের মোটা টাকা নজরানা দিয়েছে মণিবেগম। প্রকাশ্যেই দিয়েছে মোট একলক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশো সাতান্ন পাউণ্ড। খুশী হয়েছে কাউন্সিল।

মসনদে বসেই নজমুদ্দৌলা চেয়েছে তার বাবার সহকারী হিতাকাঙ্খী মহারাজ নন্দকুমারকে দেওয়ান করতে। কিন্তু বাধা দিয়েছে কাউন্সিল। কাউন্সিলের সদস্যরা নন্দকুমারের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তাই নবাবের ইচ্ছে থাকলেও দেওয়ান হতে পারেনি নন্দকুমার। কাউন্সিলের নির্দ্দেশে দেওয়ান হয়েছে রেজা খাঁ। সরে গেছে নন্দকুমার.

১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে নবাব নজমুদ্দৌলার। চুক্তি অনুসারে স্থির হয়েছে দেশ রক্ষার ভার কোম্পানীর। নবাব রাখবে নামমাত্র কিছু সৈন্য। দেশকে পাকা-পাকি ভাবে বিদেশীর হাতে তুলে দেবার আত্মঘাতী চুক্তিতে সই দিয়েছে নবাব। আমার দেশ রক্ষা করবে বিদেশীরা! শুধু তাই নয়, স্থির হয়েছে—কাউন্সিলের পরামর্শমত নায়েব নাজিম নিয়োগ করবে নবাব, কিন্তু কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে তাকে অপসারণ করা চলবে না। চুক্তির সর্ত্ত দেখে খুব খুশী হয়ে সই করেছে নাবালক নবাব। সই করেছে কোম্পানী। ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে ইংরেজ।

ভ্যান্সিষ্টার্ট সায়েব আগেই চলে গিয়েছে বিলেতে। বিলেত থেকে আবার ফিরে এসেছে লর্ড ক্লাইব। নতুন নবাব কলকাতায় গিয়ে দেখা করে এসেছে ক্লাইব সায়েবের সঙ্গে। দিয়ে এসেছে নজরানা। ধন্য হয়েছে নবাব। ধন্য হয়েছে ক্লাইব।

মে মাসে ক্লাইব এসেছে মুর্শিদাবাদে। আলোচনা করে কথাবার্ত্তা পাকা করে নিয়েছে। কোথাও ভুল হয়নি ক্লাইবের। নজমুদ্দৌলাকে বুঝিয়েছে ক্লাইব—রাজস্ব ঠিকমত আদায় হচ্ছে না, দিল্লীতে সময়মত পাঠানো হচ্ছে না টাকা, নবাবেরও খরচ খরচা আছে, রাজস্ব আদায় করতে হলে আরও কঠোর হতে হবে, প্রজা আর জমিদারকে শাসন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই এক্ষেত্রে কোম্পানী দায়িত্ব নিলে সব কাজ ঠিকমতো চলবে। নবাবকে তার প্রাপ্য কোম্পানী অবশ্যই দেবে। হাজার হলেও নবাব নাজিম। তার সম্মান রাখবেই কোম্পানী যথাযথভাবে। কোন অসুবিধা হতে দেবে না নবাবের। বরং এই সব রাজস্ব আদায়ের ঝামেলা সহ্য করতে হবে না নবাবকে। ভয় ভাবনাও থাকবে না। দিল্লীতে যা দেবার কোম্পানীই দেবে। আপদে বিপদে নবাবকে রক্ষাও করবে কোম্পানী। তাছাড়া দেশ রক্ষার ভার তো কোম্পানীর হাতেই দিয়েছে নবাব। এত সব সুন্দর

সুন্দর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছে নাবালক নবাব নাজমুদ্দৌলা। আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই খুবই খুশী হয়ে সম্মতি দিয়েছে।

চুক্তিপত্র তৈরী হলো। স্থির হলো—রাজস্ব আদায় করবে কোম্পানী আর নবাবকে বার্ষিক বৃত্তি দেবে তেপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াশী হাজার একশো একত্রিশ টাকা ন' আনা। সোজা কথায় দেওয়ানীর ভার নিলো কোম্পানী, নবাব হলো ইংরেজের বৃত্তিভোগী জমিদার মাত্র। ইংরেজের বহুদিনের সাধ পূর্ণ করলো লর্ড ক্লাইব। চুক্তিতে সই করলো নবাব। কোম্পানীর পক্ষে সই করলো মিঃ সামনার, মিঃ কার্ণাক, মিঃ ভেরলষ্ট, মিঃ সাইকস্ এবং লর্ড ক্লাইব। শুরু হলো কুখ্যাত দ্বৈতশাসন।

মহাসমারোহে নতুন নবাবের 'পুন্যাহ' হলো মতিঝিলে। নবাবের ডানদিকে বসেছে স্বয়ং লর্ড ক্লাইব। মন্ত্রী, রাজা, মহারাজা জমিদার সবাই উপস্থিত। অকাতরে অর্থব্যয় করেছে মণিবেগম। খানাপিনার এলাহি ব্যবস্থা। আলোর রোশনাই। বাজীর চমক্। অতিথি আপ্যায়ণে ত্রুটি রাখেনি মণিবেগম। ছেলের প্রথম পুন্যাহ। নবাবের মা সে। তাই সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে মণিবেগম। সার্থক হয়েছে পুন্যাহ।

মসনদে বসে নজমুদ্দৌলা। সহকারী তিনজন। রেজা খাঁ, রায় দুলর্ভ আর জগৎশেঠ খোশালচাঁদ। কাজ তো বিশেষ কিছুই নেই। যেটুকু করার তা করছে মন্ত্রীরাই। তাই হারেমে শুয়ে আর বসেই সময় কেটে যায় কিশোর নবাবের।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। নবাবীটা সহ্য হলো না বেশীদিন। পেটের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে ১৭৬৬ সালের ৩রা মে তারিখে হঠাৎ মারা গেল নজমুদ্দৌলা।

এবার নবাব হলো সৈফুদ্দৌলা। নজমুদ্দৌলার আপন ভাই। মণিবেগমের দ্বিতীয় ছেলে। আগের বছরের চেয়ে আরও বেশী

ধুমধাম করে নতুন নবাবের 'পুণ্যাহ' হলো মতিঝিলে। এবার সৈফুদ্দৌলার পাশে বসেছে মিঃ ভেরলষ্ট। নবাবের বার্ষিক বৃত্তি আগের চেয়ে কমে গিয়ে দাঁড়ালো একচল্লিশ লক্ষ ছিয়াশী হাজার একশো একত্রিশ টাকা। এবারও নতুন নাবালক নবাবের মন্ত্রী—রেজা খাঁ, ছুর্লভরাম আর জগৎশেঠ খোশালচাঁদ।

কাজ চালায় মন্ত্রীরা। পরামর্শ দেয় মণিবেগম। হারেমে সুন্দরীদের সঙ্গে সময় কাটায় সৈফুদ্দৌলা। মাঝে মধ্যে এক আধদিন সুন্দর পোষাক পরে মসনদে বসে। এমনি করেই কেটে যায় দিনের পর দিন। কিন্তু শান্তি পায়নি সৈফুদ্দৌলাও। এই সময়েই (১৭৭০ সাল) দেশে দারুণ ছুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সঙ্গে মহামারী।

সে ছুর্ভিক্ষ যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্ম্মান্তিক। কোম্পানীর অসাধু

কর্ম্মচারী তথা বেণিয়ানদের সুপরিকল্পিত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফল—'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। দেশে অজন্মা হওয়ার পরও খাদ্যশস্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার প্রায় সবটাই ছুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে কোম্পানীর প্রশ্রয়ে মজুত করে দেওয়ান রেজা খাঁ প্রমুখ কোম্পনীর কয়েকজন অসৎ কর্ম্মচারী। শুধু তাই নয় খাদ্যশস্য বোঝাই যানগুলো সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে আটক করে দেশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে ছয় সপ্তাহব্যাপী ভয়াবহ ছুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারেই বহু লোক মারা যায়। গাছের পাতা এমন কি ছুর্ব্বাঘাসও ছুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ। চারিদিকে হাহাকার। শস্যক্ষেত্র যেন মরুভূমি। পথে, ঘাটে, মাঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতদেহ ঘিরে শকুনির উল্লাস!

জনৈক বিদেশী ঐতিহাসিক এই ভয়াবহ ছুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়ে বলেছে—"The unhappy Indians were everyday perishing by thousand under this want of sustenance without any means of help and without any resource, not

being able to procure themselves the least nourishment. They were to be seen in their villages, along the public ways, in the midst of our European colonies,—pale, meagre, fainting, emaciated, consumed by famine ; some stretched on the ground in expectation of dying, others scare able to drag themselves on to seek for any nutriment, and throwing themselves at the feet of the Europeans, entreating them to make them as their slaves......" "everywhere the dying and the dead mingled together ; on all sides the groans of sorrow, and the tears of despair ; and we shall have some faint idea of the horrible spectacle Bengal presented for the space of six weeks. During this time the Ganges was covered with carcases ; the field and highways were choked up with them ; infections vapours filled the air and diseases multiplied, and one evil succeeding another, it was likely to happen, that the plague might have carried off the remainder of the inhabitants of that unfortunate kingdom. It appears by calculations pretty generally acknowledged, that the famine carried off a fourth part ; that is to say about three millions."

দেশের এই ঘোর দুর্দিনেও কিন্তু বিন্দুমাত্র মায়া দয়া দেখায়নি কোম্পানী। রাজস্ব আদায় করার নামে অবশিষ্ট রিক্ত, নিঃস্ব, অর্দ্ধমৃত জনগণের ওপর চলেছে চরম উৎপীড়ন। নিজেদের পাওনা

গণ্ডা আদায় করে নিতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা কসুর করেনি এ সম্পর্কে, ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্টেই বলা হয়েছে—"Arbitrary taxation is plunder authorised by law It is the support and essence of tyranny; and ha done more mischief to mankind than those othe three scourges from heaven, famine, pestilence anc the sword."

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বছরেও রাজস্ব বাবদ কোম্পানীর আদা হয়েছে প্রায় আঠাশ লক্ষ টাকা।

১৭৭০ সালের ১০ই মার্চ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যা নবাব সৈফুদ্দৌলা।

এবার নবাব হলো তের বছরের মোবারকদ্দৌলা। সৈফুদ্দৌলা সৎ ভাই। বব্বু বেগমের ছেলে। নাবালক মোবারকদ্দৌলা পেয়ে নিজামতী। তাই অভিভাবিকা হওয়ার জন্য কাউন্সিলের কা আবেদন জানায় মোবারকদ্দৌলার মা বব্বু বেগম। চিন্তিত হ মণি বেগম। বব্বু বেগম অভিভাবিকা নিযুক্ত হলে মণি বেগমে গুরুত্ব কোথায়? মূল্য কি? ক্ষমতা না থাকলে মানবে কে সব বোঝে মণিবেগম। তাই সে গোপনে তৈরী হয়। বব্বু বেগ হতে পারে মোবারকের মা। মণিবেগমও কম যায় না। প্রমাণ কর সে। এই খেলায় হার মানতে রাজী নয় মণিবেগম। গভর্ণর তথ ওয়ারেন হেষ্টিংস। মণিবেগমের অতি পরিচিত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলা যায় ইংরেজদের দুর্ব্বলতা কোথায় তা ভালো ভাবেই জানে মণিবেগম তাছাড়া মণিবেগমের আছে টাকা, আছে রূপ। মণিবেগমের চোখে দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভুলে যায় হেষ্টিংস সাহেব। হেষ্টিংস মানুষ মুনি ঋষি নয়। মোটা টাকা উৎকোচ পেয়েছে হেষ্টিংস। রূপ আ রূপো এক সঙ্গে গেঁথেছে হেষ্টিংসকে। অগ্রাহ্য হয়েছে বব্বু বেগমে

আর্জি। নাবালক নবাব মোবারকদ্দৌলার অভিভাবিকা নিযুক্ত হয়েছে মণিবেগম। দেওয়ান হয়েছে মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস।

নবাবের বার্ষিক বৃত্তি প্রথমে কমিয়ে দিয়ে করা হলো একত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার ন'শো একানব্বই টাকা। পরে আরও কমে গিয়ে দাঁড়ালো ষোল লক্ষ টাকায়।

কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণের পর থেকেই রাজস্ব আদায় বেড়েছে। বেড়েছে প্রজাদের ওপর অত্যাচার। ধাপে ধাপে কমে গিয়েছে নবাবের বৃত্তি। দরবারে থাকতো একজন করে ইংরেজ রেসিডেণ্ট। তার ক্ষমতা অসীম। কোম্পানী এবং নবাবের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। তাকে না জানিয়ে বা কোম্পানীর কর্ত্তাদের অনুমোদন না নিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব ছিল না নবাবের পক্ষে। একে তো নবাব ক্ষমতাহীন। তার ওপর আবার নাবালক। তাকে যা বোঝান হয় সে তাই বোঝে। কাজেই এই সুযোগে নিজামত তথা নবাব নাজিমের ওপর পুরোপুরি কর্ত্তৃত্ব করার পূর্ণ সুযোগ পায় কোম্পানী। ফলে কাগজে কলমে দ্বৈতশাসনের কথা লেখা থাকলেও কার্য্যতঃ দেশ শাসন করেছে কোম্পানী। আর সেই শাসনের নামে শোষনের শিকার হয়েছে বাংলার নিরীহ প্রজাকূল।

বাংলার এক তৃতীয়াংশ কৃষক অনাহারে মারা গেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। দেশের ঐ ঘোর দুর্দ্দিনে খাজনা আদায় করতে পারেনি কোন জমিদার আর তালুকদার। আদায় করা তো দূরের কথা, প্রজাদের দুরাবস্থা দেখে অনেক সহৃদয় জমিদার নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে সাহায্য করেছে প্রজাদের। ইচ্ছে থাকলেও খাজনা আদায় করতে পারেনি তারা। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে কেউ কেউ।

কিন্তু কোম্পানী কোন যুক্তি মানতে নারাজ। দেশের দুরাবস্থার কথা শুনতে আসেনি তারা। তারা এসেছে ব্যবসা করতে। এসেছে

এদেশের সম্পদ আহরণ করতে। কেউ কেউ আবার ভাগ্যের উন্নতি-কল্পেও এসেছে বটে। কাজেই সেখানে মায়াদয়ার কোন স্থান নেই। রাজস্ব তাদের চাই-ই। জমিদাররা কোম্পানীকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে বাধ্য। কি করে দেবে, কোথা থেকে দেবে—সেসব কথা শুনতে কোম্পানী রাজী নয়।

জমিদারদের সকাতর অনুনয় বিনয় সব ব্যর্থ হলো। কোম্পানী অটল। টাকা তাদের চাই-ই।

ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন গভর্ণর জেনারেল। নবাব তার কর্ম্মচারী মাত্র। কোম্পানীই সর্ব্বেসর্ব্বা। কোম্পানীর বক্তব্য বুঝতে দেরী হয়নি অনুগত অসৎ কর্ম্মচারীদের। হেষ্টিংসের ইঙ্গিতও তারা বুঝেছে। কোম্পানীর নির্দ্দেশ—খাজনা আদায় করতেই হবে। যেভাবে হোক রাজস্ব আদায় করো। কোম্পানীকে সন্তুষ্ট করতে কসুর করেনি কর্ম্মচারী আর বেনিয়ানের দল। হেষ্টিংস আর রেজা খাঁর প্রিয় শিষ্য—দেবী সিং আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং। নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্রই শুরু করে দিয়েছে কাজ। দেরী করেনি একমুহূর্ত্তও।

রাজস্ব আদায়ের নামে শুরু হয়েছে ডাকাতি আর রাহাজানি। চলেছে অবাধ লুঠতরাজ, অমানুষিক অত্যাচার, ব্যাপক নারীধর্ষণ। এদের অবাধ অত্যাচারের শিকার হয়েছে সাধারণ প্রজা থেকে শুরু করে বিশিষ্ট জমিদার, তালুকদার, রাজা, মহারাজা সকলেই। রেহাই পায়নি কেউ। রাজস্ব জমা না দেওয়ার অপরাধে বন্দী হয়েছে সম্ভ্রান্ত প্রজা, তালুকদার, জমিদার। তাদেরকে বিবস্ত্র করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বিছুতির চাবুক মারা হয়েছে পেটে, পিঠে, সর্ব্বাঙ্গে। শরীর দিয়ে রক্ত ঝড়েছে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে তবুও রেহাই নেই। অচৈতন্য বন্দীদের ফেলে রাখা হয়েছে অন্ধকার কারাগারে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটেছে অনাহারে। নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের ফলে মারা গেছে

একাধিক বন্দী। বাকীরা অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় নীরবে কামনা করেছে মৃত্যু। এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি শিশু, বৃদ্ধ এমন কি মহিলারাও। সম্ভ্রান্ত প্রজা আর জমিদারদের স্ত্রী, কন্যাদের বন্দী করে আনা হয়েছে। পিতার সামনে কন্যাকে এবং স্বামীর সামনে স্ত্রীকে উলঙ্গ করে শুরু হয়েছে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন। পাইক বরকন্দাজ আর রক্ষীদের ঘৃণ্য জৈবিক লালসার শিকার হতে বাধ্য করা হয়েছে সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীদের। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য পৈশাচিক উল্লাসে উপভোগ করেছে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা। সুরা আর সাকী নিয়ে বিভোর ওয়ারেন হেষ্টিংসের মৌতাতে ঘটেনি কোন বিঘ্ন।

নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের আতঙ্কে ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে সাধারণ মানুষ। এই অত্যাচার বর্ণনা করে বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্যর উইলিয়াম মেরেডিস বলেছে—"Comparisons of other tyrannies give no idea of British tyranny in Bengal. For it has been the provincc of tyrants to use their iron rods over the great and powerful; over men who became formidable for their virtues or whose riches were provocatives to their avarice ; the bulk of their people might live in quiet; the low and humble man, the labourer and the mechanic were beneath the tyrant's stroke. But in Bengal, the rich, and the poor fare alike. They who have lands are dispossessed; if money, 'tis exorted : if the mechanic has a loom, his manufacture is cut out; if he has grain, 'tis carried off, if he is suspected of having any secret treasure, he is put to the torture to discover it. One is therefore at a loss for words to describe the sort of tyranny

in that is practised in Bengal. Monsters as tyrants are, they are but rare monsters; and very rare indeed, such as have been hardened against all fear of punishment and all sense of shame".

কোম্পানীর অত্যাচার দেখে শুনেও নবাব নীরব। প্রতিবাদের শক্তি নেই। ক্ষমতাও নেই। কারণ নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর। নবাবের নয়। কাজেই কোম্পানীর কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই নবাবের। তাই বাধ্য হয়েই অত্যাচার আর অবিচার দেখে শুনে হজম করতে হয়েছে নবাবকে।

বণিকের ছদ্মবেশে ওরা যেন বিদেশী লুঠেরার দল। ওরা এসেছে লুঠ করতে। লুঠ করে নিয়ে গেছে এদেশের সম্পদ। শাসনের নামে শোষণ চালিয়ে সোনার বাংলাকে পরিণত করেছে শ্মশানে। রিক্ত নিঃস্ব জনগণের জন্য ওরা অবশিষ্ট রাখেনি কিছু। এদেশের সম্পদ জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গেছে সাগর পারের দেশে। ওরা সুসভ্য ইংরেজ জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করেছে। ওরা যেন শতাব্দীর দস্যু বিশেষ।

কয়েক বছর পরে এই অত্যাচারের জের হিসেবে ইংলণ্ডের বিচার সভায় হেষ্টিংস সায়েবকে দাঁড়াতে হয়েছে প্রধান আসামীর কাঠগড়ায়। ভারতের লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত নিঃস্ব মানুষের অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হয়েছে স্যর এডমণ্ড বার্ক এর কণ্ঠে :—

"I impeach him in the name of the Commons' House of Parliament, whose trust he has betrayed, I impeach him in the name of the English nation whose ancient honour he has sullied. I impeach

him in the name of the people of India, whose rights he has trodden under foot, and whose country he has turned into a desert. Lastly in the name of human nature itself, in the name of both sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all''.

নাবালক নবাব মোবারকদ্দৌলা আর কোম্পানীর মধ্যে ১৭৭০ সালের ২১ শে মার্চ্চ সম্পাদিত চুক্তিপত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—বাদশাহ বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী চিরদিনের জন্য বিনামূল্যে দান করেছে কোম্পানীকে। স্বয়ং বাদশাহর কাছ থেকে ফরমান পেয়েছে কোম্পানী। নবাবকে সে গ্রাহ্য করবে কেন? বরং নবাব বাধ্য থাকবে কোম্পানীর কাছে। কারণ বাদশাহী স্বীকৃতি পাওয়ার পর, কার্য্যতঃ কোম্পানীই হয়ে উঠেছে নবাবের প্রভু।

খালসা আর রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে উঠে গেল কলকাতায়। মাথায় হাত দিলো জগৎশেঠ খোশলচাঁদ। প্রতিপত্তি হারালো মহিমাপুরের শেঠবাড়ী। পলাশীযুদ্ধে পিতৃপুরুষের ভুলের মাশুল গুণেছে জগৎশেঠ খোশলচাঁদ। খালসার ভার ফিরে পাওয়ার জন্য হেষ্টিংসের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে জগৎশেঠ।

গভর্ণর জেনারেলের অনুরোধে মোবারকদ্দৌলার আদেশে ১৭৭৭ সালে বন্ধ হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদের টাকশাল। একটা একটা করে দপ্তর চলে গেছে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায়। প্রতিবাদ করেনি কেউ। করার সাহসও ছিল না। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের চেয়ে কলকাতাকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশী।

মারা গেছে খোশলচাঁদ। অন্ধকার হয়ে গেছে মহিমাপুর। হেষ্টিংস সায়েবের উপহার আর নবাবের দেওয়া উপাধি নিয়ে জগৎশেঠ হয়েছে খোশলচাঁদের ভাই এর ছেলে নাবালক হরকচাঁদ।

হেষ্টিংসের পর এসেছে লর্ড কর্ণওয়ালিশ। এই আমলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। ১৭৯৩ সালে নিজামত আদালত উঠে গেছে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায়। অন্ধকার হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ।

প্রায় তেইশ বছর নবাবী করার পর ১৭৯৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মারা গেছে মোবারকদ্দৌলা। এরপরে মসনদে বসেছে মোবারকদ্দৌলার ছেলে বাবরজঙ্গ। এর আমলেই মণিবেগম মারা যায়। বাবরজঙ্গের পর মসনদে বসেছে তার ছেলে আলিজা। আলিজার পর এসেছে তার ভাই ওয়ালাজা। উল্লেখ করার মত কিছুই নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে কোম্পানীর দয়ায় একের পর এক এসেছে, নবাবী করেছে, চলে গিয়েছে। লোকে বলেছে নবাব। তারা নিজেরাও ভেবেছে নবাব। কিন্তু মূলতঃ নবাবের ছায়ামাত্র।

আলিজার মৃত্যুর পর ১৮২৪ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর নবাব হয়েছে তার ছেলে হুমায়ুন জা। বিলাসী এই নবাবের কিছু কিছু কীর্ত্তি আজও দাঁড়িয়ে আছে মুর্শিদাবাদে। এর আমলেই তৈরী হয় হাজারদুয়ারী প্রাসাদ। তৈরী হয় নবাবের বিশাল আস্তাবল—যা দেখে গভর্ণর সায়েব না বুঝে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছে—Is it Nawab palace? হুমায়ুন জার নামানুসারে তৈরী সুরম্য বাগানবাড়ী—'হুমায়ুন মঞ্জিল' —আজ নিশ্চিহ্ন।

তখনও পর্য্যন্ত নবাব নাজিমদের সম্মান ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে নবাবকে জানানো হতো। গভর্ণর অকল্যাণ্ড সায়েব স্বয়ং নবাবকে চিঠি লিখে জানিয়েছে—রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যলাভের সংবাদ। নবাব কলকাতায় গিয়ে সে সময়ের বিশিষ্ট শিল্পী কবি নারির আঁকা পুত্র সহ নবাবের ছবি উপহার দেয় রাজারাণীকে। রাজারাণীও তাদের ছবি নবাবকে উপহার দেয়। তখনও নবাবের কলকাতা আগমণের সংবাদ প্রকাশিত হতো খবরের কাগজে।

হুমায়ুন জার আমলে, ১৮৩৮ সালে, চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করে ইংরেজ সরকার নবাবকে জানায়—বৃত্তিভোগী বেগমদের মৃত্যুর পর তাদের বৃত্তি রহিত হয়ে যাবে এবং সেই টাকার ওপর নবাব নাজিমের কোন দাবী থাকবে না। কারও কারও মতে এই সংবাদই নবাবের মৃত্যুর কারণ।

১৮৩৮ সালের তেসরা অক্টোবর মারা যায় হুমায়ুন জা। মসনদে বসেছে তার নাবালক ছেলে ফেরাদুন জা। ১৮৩৮ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উনিশটি তোপধ্বনি করে এই সংবাদ জানানো হয় সর্ব্বসাধারণকে। খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয় নবাবের মসনদ লাভের সংবাদ।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম—ফেরাদুন জা। ইংরেজ সরকার ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে খর্ব্ব করেছে নবাবের সম্মান আর প্রতিপত্তি। তাদের সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে ফেরাদুন জার আমলে। বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা বৃত্তির মধ্যে নবাব পায় নিজের জন্য মাত্র সাত লক্ষ টাকা। নতুন আইন তৈরী করে স্থির হলো—গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছে করলে নবাবের বৃত্তি কমিয়ে দিতে পারবে। নিজামত কেল্লার মধ্যে এতকাল ছিল না সাধারণের প্রবেশাধিকার। এখন প্রত্যাহার করা হলো সেই নিষেধাজ্ঞা। নবাবের সম্মানে যে উনিশবার তোপধ্বনির ব্যবস্থা ছিল, তা হ্রাস করে নির্দ্দিষ্ট করা হলো তেরটি তোপধ্বনি। নিজামতের সম্মান লাঘব করাই ছিল এই সব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। মণিবেগমের তথা নিজামত তহবিলে সঞ্চিত বিপুল টাকা ফেরৎ পায়নি নবাব নাজিম।

সব দিক থেকে নিজামতের অবশিষ্ট সম্মান আর গৌরব খর্ব্ব করে দিয়েছে ইংরেজ।

তবু শেষ চেষ্টা করেছে ফেরাদুন জা। নিজামতের গৌরব হ্রাসের বিরুদ্ধে এবং নিজামত তহবিলের টাকার ওপর নিজের দাবী জানিয়ে

আপীল করেছে ষ্টেট সেক্রেটারী স্যর চার্লস উডের কাছে। পরে ১৮৬৯ সালে ফেরদুন জা নিজেই গিয়েছে ইংলণ্ডে নিজের দাবীর নিষ্পত্তি করতে। ফল হয়নি কিছুই। মাত্র দশ লক্ষ টাকা দিয়ে নবাবকে নিরস্ত করেছে ইংরেজ সরকার। পরিবর্ত্তে নবাব নাজিমকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। ত্যাগ করতে হয়েছে নবাব নাজিম উপাধি। ছেড়ে দিতে হয়েছে বকেয়া টাকাকড়ির দাবী। এই উপলক্ষে ১৮৮০ সালের ১লা নভেম্বর ফেরাদুন জার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যে চুক্তি হয় তাতে লেখা অছে :—

Article third :—The said Nawab Nazim acknowledges the said sum of 10 lacs of rupees to be in full satisfaction and discharge of all his personal claims in respect of arrears of stipend and of the advance sanctioned by the Secretary of State for India in council in 1869; and in respect of the jewels and other moneys and property claimed by him as aforesaid and in respect of his personal claims of what nature or kind soever, and whether connected with or arising out of the Nizamat or otherwise. And he doth hereby release the Secretary of State for India in council, and the Viceroy and Governor General of India in Council, and all the other servants and agents of the British Government, whether in England or in India, from all claims and demands, of his in respect of the said several matters in this Article mentioned.

Article fourth :—The said Nawab Nazim doth hereby (but without prejudice to such rights as any

member of his family may have) relinquish and retire from the said Nizamat and Subadary, and his position as Nazim and Subadar of Bengal, Bihar and Orissa and his right as Nawab Nazim, for the time being, to the authority dignities, stipend pay, allowances, property, privileges and right thereof, or in anywise thereunto annexed or appertaining, or therewith enjoyed, and all rights and title to interfere or intermeddle hereafter in any way directly or indirectly with anything concerning the said Nizamut and Subadary".

এইভাবে নবাব নাজিম উপাধি ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে ফেরাছন জা। ১৮৮১ সালেই ছেড়ে দিয়েছে মুর্শিদাবাদের মসনদ। মারা গেছে ১৮৮৪ সালের ৫ই নভেম্বর। ঐ একই দিনে মারা যায় ফেরাছন জার অন্যতম স্ত্রী মালকা জামানিয়া বেগম।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ১৮৮১ সালেই। বাকীটুকু ইতিহাস নয়, কাহিনী মাত্র।

এরপর থেকে নবাবের উপাধি হলো—নবাব বাহাছর অফ মুর্শিদাবাদ। ফেরাছন জার প্রধান বেগম সামসজাঁহার গর্ভজাত ছেলে স্থলতান অকালে মারা যায়। এই স্থলতান সায়েবের নাতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা পরবর্ত্তী কালে পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট হয়।

ফেরাছন জার জীবিত বড় ছেলে হাসান আলী মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব বাহাছর। তার বার্ষিক বৃত্তি স্থির হয় ছ'লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। হাসান আলির মৃত্যুর পর (১৯০৬ সাল) তার ছেলে ওয়াশিফ আলী মির্জা মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব বাহাদুর। ওয়াশিফ আলী মির্জ্জার মৃত্যুর পর নবাব হয়েছে তার ছেলে ওয়ারিশ আলী মির্জ্জা।

১৯৬৯ সালে মারা গেছে ওয়ারিশ আলী। এরপর আর কেউ নবাব হয়নি।

এই হচ্ছে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। অবনতির ইতিহাস। ধ্বংসের ইতিহাস। যার প্রতিটি অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা। মাঝে মধ্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে দেশপ্রেমের দীপশিখা।

নবাবী রাজত্বে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না নবাবের। প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টি দেয়নি নবাব। অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টাও করেনি। কার্য্যতঃ নবাব ছিল সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। প্রজারা দূর থেকে অবাক বিস্ময়ে দেখেছে নবাবের বিশাল শোভাযাত্রা, আলোর রোশনাই; হাতী, ঘোড়া, উট আর সিপাই সান্ত্রীর মিছিল। হাতীর পিঠে নবাবকে দূর থেকে দেখেই ধন্য হয়েছে তারা। হাত জোড় করে অথবা মাথা নত করে জানিয়েছে সম্মান। করেছে শ্রদ্ধা। সব চেয়ে বেশী করেছে ভয়।

প্রজারা খাজনা দিয়েছে জমিদারকে। জমিদাররা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিয়েছে নবাবের দরবারে। রাজস্বের টাকা সময় মত জমা না হলে নবাবের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে জমিদার। অনুরূপ ভাবে জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে সাধারণ প্রজা।

অত্যাচার ছিলো নবাবী আমলেও। নিরাপত্তা ছিল না মানুষের ধন সম্পদের, তথা জীবনের। সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে স্ত্রীলোকেরা। বিশেষ করে সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা। রূপ আর যৌবন তাদের কাছে ছিল অভিশাপ। অন্ধকার গৃহকোণে আতঙ্কে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে তারা। বাইরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেনি। তেমন কারও নজর পড়লে রক্ষা পেতোনা তারা। অসহায় ছিল বিধবারা। লুকিয়ে থেকেও রেহাই পায়নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই

আঠারো শতকে হিন্দু বিধবারা ধর্ম্মনাশ এবং অযথা কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে ও জাতি, কুল, মান মর্য্যাদা রক্ষা করতে মৃত স্বামীর চিতায় উঠে সহমৃতা হওয়াই শ্রেয় মনে করেছে।

সব রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে সাধারণ প্রজা। অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সাহস বা ক্ষমতা ছিল না কারও।

নবাবী মানেই বিলাসিতা। মোগল রাজত্বে এই ছিল রীতি। অধিকাংশ নবাব নাজিম এই রীতিতেই ছিল বিশ্বাসী। ভোগবিলাস, সুখ আর ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই তারা খুঁজে পেয়েছে তৃপ্তি আর শান্তি।

ক্ষমতালিপ্সা, অবিশ্বাস আর প্রবঞ্চনার কালোছায়ায় ওলটপালট হয়েছে মসনদ। ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে মন্ত্রী, উজির, রাজা, মহারাজা সবাই। পলাশীর যুদ্ধই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে সরফরাজকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল আলীবর্দি। দাদুর সেই অপরাধের মাশুল দিয়েছে নাতি সিরাজদ্দৌলা নিজের জীবন দিয়ে। ক্ষমতায় এসেছে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। আবার তাকেও সরিয়ে দিয়ে মসনদে বসেছে অপর বিশ্বাসঘাতক মীরকাশেম।

অর্থই অনর্থের মূল একথা প্রমাণিত হয়েছে নবাবী আমলে। অর্থের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মসনদ। সামান্য সৈন্য থেকে সেনাপতি পর্য্যন্ত ছিল অর্থের বশীভূত। যে নবাবী সৈন্য নবাবের অধীন, অর্থের প্রলোভনে তারা নবাবের আদেশ করেছে অমান্য। মহিমাপুরের গদীতে বসে ব্যবসা করেছে জগৎশেঠ। সারা দেশ জুড়ে ছিল তার জাল প্রসারিত। মহিমাপুরের গদীতে বসেই ব্যবসার সঙ্গে রাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করেছে জগৎশেঠ। তার অমোঘ অদৃশ্য সঙ্কেতে ঘটেছে ইতিহাসের অনেক অঘটন। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায়—"The Rupees of Hindu Banker, equally with the sword of

English Colonel contributed to the overthrow of the Mahamedan power in Bengal."

রাজনৈতিক চেতনা বলতে কি বোঝায়—সেকথা জানতো না দেশের লোক। কেউ তাদের বলেনি। তারাও জানতে চায়নি অন্ধকারেই তারা ছিল। সেখানেই থেকেছে। আলোতে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেনি কেউ। আর তাই পলাশী যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ে তারা হয়নি কাতর। পরবর্ত্তীকালে ইংরেজের অভ্যুত্থানেও তারা হয়নি চঞ্চল। দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার তথা গণ্যমান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যদি নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত না হতো, ক্ষমতার লোভকে যদি বিসর্জ্জন দিতে পারতো, আত্মসুখে মগ্ন না হয়ে যদি দেশ বা দশের কথা অন্তত: কিছুটাও চিন্তা করতো, সর্ব্বোপরি যদি দেশের সাধারণ লোককে অন্ধকারে না রেখে কিছুটা আলো দেখাতে পারতো তাহলে হয়তো ইতিহাসের গতি হতো অন্যরকম। কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ সেই সব রাজা, মহারাজা, জমিদার তথা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল কোন না কোন ষড়যন্ত্রের অংশীদার। মুষ্টিমেয় যে দু'একজন এই সব ষড়যন্ত্র থেকে দূরে ছিল তারাও কিছু করেনি অথবা করতে পারেনি।

দেশের কথা চিন্তা করার অপেক্ষা মাসোহারার টাকায় নবাবী করাটাই শ্রেয় বলে মনে করেছে অপদার্থ নবাব নাজিম। তাই কোম্পানীর হাতে সব দায়িত্ব তুলে দিয়ে মাসোহারার টাকায় ভোগ বিলাসে মত্ত থেকেছে নবাব। ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশের সম্পদ লুঠ করেছে বিদেশী বণিক। এ দেশের টাকায় সমৃদ্ধ হয়েছে বিদেশের শিল্প-সম্ভার। লণ্ডনের সেণ্ট পল্ গির্জ্জার ডীন্ W. R. Inge সায়েবের মতে—"The first impetus was given by the plunder of Bengal, which after the victories of Clive, flowed into the country in a broad stream for about thirty

years. This illgotten wealth played the same part in stimulating English industries as, the "five milliards" extorted from France, did for Germany after 1870.

কোম্পানীর রাজত্বে মানুষ শিখেছে গোলামী আর তোষামোদ। আত্মনির্ভর হতে শেখেনি মানুষ। শিখেছে অতিমাত্রায় পরনির্ভরশীলতা। সেলাম জানিয়ে, একটু অনুগ্রহ লাভ করেই ধন্য মনে করেছে। এতে নীট্ লাভ হয়েছে কোম্পানীর। কারণ এর ফলে শোষণের রাস্তাটা ছিল পরিষ্কার। এই রাজত্বে পূর্ব্বতন বনেদী জমিদাররা হয়েছে নানাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্থ। কেউ কেউ হয়েছে নিঃস্ব' বাকী খাজনার দায়ে অথবা অন্য কোন অজুহাতে তাদের মূল্যবান ভূসম্পত্তি তথা জমিদারী নীলাম করে হস্তগত করেছে কোম্পানীর একান্ত অনুগ্রহভাজন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্ম্মচারী অথবা বেনিয়ান। শোষণ করেছে ইংরেজ ঠিকই। কিন্তু সেই শোষণে সাহায্য করেছে এ দেশেরই কিছু লোক। কোম্পনীর অনুগ্রহে এরা সামান্য অবস্থা থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই অর্জন করেছে লক্ষ লক্ষ টাকা, বিশাল সম্পত্তি। সেই সঙ্গে রাজা, মহারাজা উপাধি। কাশিমবাজার কুঠীতে আট টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ছিল কান্তমুদি। তার বক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ছিল মাত্র দেড় হাজার টাকা। গভর্ণর হেষ্টিংস সায়েবের অনুগ্রহে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিশাল সম্পত্তির ও অর্থের মালিক হয়ে কান্তমুদি হলো কান্তবাবু। পলাশীর যুদ্ধের সময় রামচাঁদ ছিল ত্রিশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী। দশ বছর পর মৃত্যুকালে রেখে যায় নগদ সাত লক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড, সোনা ও রূপো ভর্ত্তি চারশোটি পাত্র, এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড দামের ভূ-সম্পত্তি এবং দু লক্ষ পাউণ্ড দামের মণিমুক্তা। পোস্তার রাজবংশের আদি পুরুষ নকু ধরের বাড়ীতে মুহুরীর কাজ করতো নবকৃষ্ণ। পরে সে ক্লাইবের বেনিয়ান হয়। এতেই তার ভাগ্য খুলে যায়। পরবর্ত্তীকালে লক্ষ লক্ষ টাকার ও বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হয় নবকৃষ্ণ।

এবার বিদেশী বণিকের কথা ধরা যাক্। পলাশী যুদ্ধের পর হীরাঝিল প্রাসাদের প্রকাশ্য ধনাগার লুঠের বখরা বাবদ ক্লাইব সায়েব পায় প্রকাশ্যে দু লক্ষ আশী হাজার টাকা। এ ছাড়া চরম কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাকে মীরজাফর দিয়েছে আরও এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ভাগ বাঁটোয়ারায় সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাইব নিজেই বলেছে—"The terms exceeded my expectations".

এ সব তো হলো প্রকাশ্য হিসাব। অপ্রকাশ্যে ক্লাইব কত টাকা পেয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায়—অপ্রকাশ্য হিসাব অনেক বেশী। ক্রাফটন সায়েব বলেছে—ত্রিশখানা নৌকা বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে গেছে ক্লাইব। কাজেই অনুমান অমূলক নয়। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন মৃত্যুকালে রেখে যায় সত্তর লক্ষ টাকা। নৌসেনানী পোকক্ অর্জন করে বিপুল অর্থ। ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম যখন এদেশে আসে তখন তার বেতন ছিল মাত্র পনের টাকা। কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয় বিশাল ধন সম্পত্তির মালিক। হেষ্টিংস এদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর ১৭৮৫ সালে তার এ দেশীয় যে সব সম্পত্তি নীলামে বিক্রি করা হয় তার মধ্যে ছিল ৬৩ বিঘার বিরাট বাগান বাড়ী, ৪৬ বিঘার আস্তাবল সহ বিশাল অট্টালিকা, কাঠের রেলিং ঘেরা ৫২ বিঘা জমি, ১৩৬ বিঘার বাগান, রূপোর বাসন প্লেট, টেবিল চেয়ার, হাতীর হাওদা, ঘোড়ার সাজ, ঝালরদার পালকি, নৌকা, তাঁবু, বাদ্যযন্ত্র, ছবি ইত্যাদি।*

শুধু উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী সায়েবরাই নয়, সাধারণ গোরা সৈনিক এমন কি মাঝি মাল্লারাও প্রত্যেকে কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ফিরে গেছে স্বদেশে। এদেশের লোক দাঁড়িয়ে দেখেছে।

* উইলিয়াম ওলি এণ্ড কোম্পানী, ১৭৮৫ সালের ১০ই মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে হেষ্টিংসের কিছু সম্পত্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে।

কোম্পানীর গোলামী আর তোষামোদ করে ধনী এবং বিত্তশালী হয়েছে এদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন রাজা মহারাজা। শাসনের নামে শোষণে এদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এরাই তখন ছিল জাতি কাছারীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বাংলার সমাজ জীবনের নিয়ামক। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা ছিল এদের পৃষ্টপোষক।

এই আমলে দুর্দ্দশা বেড়েছে বনেদী জমিদার তথা রাজাদের। তাদের অপরাধ—তারা সন্তুষ্ট করতে পারেনি কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর এ দেশীয় স্তাবকদের। তাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা। তাদের মূল্যবান সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেই সব সম্পত্তির ইজারা পেয়েছে কোম্পানীর স্নেহধন্য নতুন নতুন রাজা মহারাজা।

কোম্পানীর তথা গভর্ণরের অনুগ্রহ বা কৃপাদৃষ্টি লাভ করে ধন্য মনে করতো অনেকেই। এমনকি নবাব নাজিম পর্য্যন্ত। গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম দুঃখে এবং অভিমানে গঙ্গার জলে ফেলে দেয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সামগ্রী।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কলঙ্ক। গভর্ণর হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ জানায় নন্দকুমার। এতে ক্রুদ্ধ হয় হেষ্টিংস। দুর্ভাগ্যক্রমে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ে নন্দকুমার। বিচারক স্যর ইলাইজা ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু। নন্দকুমারের বিপক্ষে এই মামলায় নেপথ্য তদ্বিরকারক স্বয়ং হেষ্টিংস। বন্ধুর শত্রুকে শায়েস্তা করেছে ইম্পে সায়েব। ফলে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হয়। সন্দেহ নেই, এই প্রাণদণ্ড হয় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। মেকলে সায়েবের মতে—'It is therefore

our deliberate opinion that Impey, sitting as a Judge, put a man unjustly to death to serve a political purpose'.

এই অন্যায় প্রাণদণ্ডাদেশের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভীতিভাব সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলো হেষ্টিংস। তৎকালীন কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ প্রতিনিধির কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তার পরিণামের দৃষ্টান্ত ছিল—নন্দকুমারের ফাঁসি। তাই এই ঘটনার পর গভর্ণর জেনারেল তথা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে সাহস করেনি কেউ।

নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাদেশের খবর শুনে দেশবাসী যখন মর্মাহত, তখন (প্রাণদণ্ডের আগেই) কোম্পানীর অনুগৃহীত নবকৃষ্ণ, হুজুরুমল, রামলোচন প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের কাছে চিঠি লিখে ইংরেজের বিচার শক্তির তারিফ করে অভিনন্দন পাঠায়।

যে হেষ্টিংসের কোপানলে পড়ে নন্দকুমারকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয় সেই হেষ্টিংসের অনুগ্রহেই দেওয়ানী পায় নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস।

কয়েক বছর পর, ইংলণ্ডে হেষ্টিংসের বিচারের সময় তার কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু হেষ্টিংসের স্বপক্ষে এদেশ থেকে কয়েকটি প্রশংসাপত্র পাঠায়। এই প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা থেকে শুরু করে জমিদার, রাজা, মহারাজা এমনকি কাশী, নবদ্বীপের একাধিক পণ্ডিত। বিস্ময়কর হলেও সত্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দেখা যায় নন্দকুমারের দৌহিত্র রাজা মহানন্দ, রামকৃষ্ণ এবং মহারাণী ভবানীর হস্তাক্ষর।

ইংরেজ রাজত্বে অর্থের মোহ গ্রাস করেছে মানুষকে। তাই

অর্থের জোরেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন আধিপত্য করেছে সমাজের ওপর। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে হিন্দু পণ্ডিত ও মৌলভীরা অর্থের বশীভূত হয়েই হারায় তাদের নিজস্ব গৌরব, স্বাধীনতা এবং তেজস্বিতা।

পলাশী যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক নায়কদের বংশধররা পূর্ব্বপুরুষের ঘৃণ্য আচরণের জন্য ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পূর্ব্বপুরুষের সেই দেশদ্রোহিতার নজিরকে মূলধন করে তারা ইংরেজ সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য দাবী করেছে এমন কিছু কিছু প্রমাণ নথীপত্রে পাওয়া যায়। বোর্ড অফ রেভিনিউ এর ১৭৯৮ সালের ১০১৭ নং পত্রে দেখা যায়—রাজবল্লভের পরামর্শেই সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এবং এর ফলেই ইংরেজ জয়ী হয়—এই কারণ উল্লেখ করে অর্থ সাহায্য দাবী করেছে রাজবল্লভের বিধবা স্ত্রী।

নিজামতের গৌরব, সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা তথা নিজামত তহবিলের ওপর নিজের দাবী জানিয়ে স্যর চার্লস উড্ এর কাছে লেখা ১৮৬০ সালের ৮ই এপ্রিলের চিঠিতে শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা লিখেছে—"To explain fully the real merits of my case it is necessary to revert to the accession of my family to the Nizamut in the year 1757, when, owing to a secret Treaty between Lord Clive and my ancestor Meer Mahomed Jaffer Ali Khan, the battle of Plassey was won, and the East India Company in return acknowledged the latter as Subadar of Bengal, Bihar and Orissa, which dignity has been ever since held by his descendants, of whom I, the present Nawab Nazim, am the ninth in succession."

বৃত্তি এবং পেনসন ছিল কোম্পানীর সম্মোহনের প্রধান অস্ত্র। এই অস্ত্রের প্রভাবেই কোম্পানীর বশীভূত ছিল রাজা, মহারাজা, নবাব

প্রমুখ অনেকেই। সাধারণ মানুষ দেখেছে কোম্পানীর অসীম শক্তি। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখেছে দেশের রাজা, জমিদার, নবাব, উজির সবাই কোম্পানীর অনুগ্রহ লাভে কত আগ্রহী। কোম্পানীকে তুষ্ট করতে কি বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা। প্রজারা দেখেছে শুধু তোষামোদ করে, অথবা বেনিয়ানী করে ধনী হয়েছে, রাজা মহারাজা হয়েছে একাধিক লোক। এই সব দেখে তারাও অনুপ্রাণিত হয়েছে। শিখেছে আরও বেশী গোলামী। দেশের লোককে গোলাম তৈরী করে শাসন এবং শোষণ করেছে কোম্পানী। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৭৮৪ সালের প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"The result of the Parliamentary enquiries has been that the East India Company was found totally corrupted and totally perverted for the purpose of its institution, whether political or commercial."

যারা একদিন এসেছিল এদেশে বণিকের বেশে, নিছক ভাগ্যান্বেষণে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল নবাবের দরবারে, শুধু ব্যবসা করার অনুমতি চেয়ে, নিয়তির অমোঘ নির্দ্দেশে কয়েক বছর পরে তারাই হয়েছে এদেশের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ামক। নবাব থেকে রাজা মহারাজা এমন কি সাধারণ প্রজা সবাই জোড় হাত করে দাঁড়িয়েছে সেই নতুন প্রভুদের সামনে। মঞ্চসফল এই নাটকে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, ইয়ারলতিফ প্রমুখ রথী মহারথী।

বাংলার সম্পদ মুছে নিয়ে গেছে বিদেশী বনিক। দেশবাসী হয়েছে নিঃস্ব। দুর্ভাগ্য, এ কাজে সাহায্য করেছে এদেশের লোক।

প্রজাশক্তি সেদিন ছিল না সংগঠিত। ছিল না উপযুক্ত নেতৃত্ব। তাই মুখ বুজে মার খেয়েছে সাধারণ মানুষ। প্রজাশক্তির নীরবতাও

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। প্রজাশক্তি বিদ্রোহী হলে ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন হতো সন্দেহ নাই।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যি। কিন্তু অনেক দেরীতে।

স্বাধীনতার পর গড়ে উঠেছে অনেক নতুন নগর, নতুন জনপদ। অতীতের ম্লান স্মৃতি নিয়ে ইতিহাসের কঙ্কাল স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে অভিশপ্ত মুর্শিদাবাদ।

পলাশীর ময়দানে যে সূর্য্য অস্ত গিয়েছে সেদিন, পরবর্ত্তীকালে তা আর ওঠেনি। উধুয়ানালার প্রান্তরে ওঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। অন্ধকারে তলিয়ে গেছে সব।

ভারতের ইতিহাসে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—গৌরব আর কলঙ্কের এক মিশ্রিত অধ্যায়।

নিজামত বৃত্তি
ও
নিজামত তহবিল
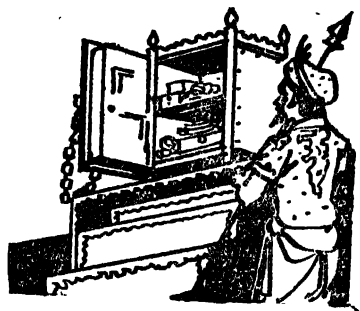
নিজামত তহবিল সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অর্থাৎ এই তহবিল কি, এর উদ্দেশ্য কি ছিল কতো টাকা তহবিলে জমা ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই টাকাই বা কোথায় গেল—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই অজানা। সমসাময়িক ইতিহাসেও এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়নি। যার ফলে এই তহবিল সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা তুঃসাধ্য।

তবুও পুরানো পুঁথি, সমসাময়িক কিছু চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার ওপর ভিত্তি করেই আমার এই নিবন্ধ।

'নিজামত' শব্দের অর্থ হলো নবাব পরিবার। ইংরাজীতে বলা যায়—Royal Family. এই অর্থে 'নিজামত তহবিল'-এর অর্থ হলো নবাব পরিবারের তহবিল।

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে নিজামত ট্রেজারী ছিল। যার সর্ব্বম কর্ত্তা ছিল নবাব নাজিম। নবাব পরিবারের সদস্যরা পেতো ষ্টাইপে' বা বৃত্তি আর পরিবারের আত্মীয়, আশ্রিত ব্যক্তি, নোকর বা ভৃত্যর পেতো পেনসন বা ভাতা। নবাব নাজিমের নির্দ্দেশমত এই বৃত্তি ব ভাতার টাকা সরাসরি প্রাপককে দেওয়া হতো নিজামত ট্রেজারী থেকে

পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই নবাব নাজিম কার্য্যতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানী আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে নবাব তখন বৃত্তিভোগী জমিদার মাত্র।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ সালে তার পুত্র নজমুদ্দৌলা মসনদে বসেই কোম্পানীর সঙ্গে দেওয়ানী হস্তান্তরের চুক্তি করে। সেই চুক্তিতে বলা হয়—কোম্পানী যতদিন বাংলায় থাকবে ততদিন নিয়মিত ভাবে কোম্পানী নবাবকে বাৎসরিক তিপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশো একত্রিশ টাকা ন' আনা দিতে বাধ্য থাকবে। এই টাকার মধ্যে সতের লক্ষ আটাত্তর হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা এক আনা নবাব পরিবারের জন্য এবং বক্রী ছত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুশো সাতাত্তর টাকা আট আনা নবাবের অনুচর, রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

নজমুদ্দৌলা মারা যাওয়ার পরে তার ভাই সৈফুদ্দৌলা যখন মসনদে বসলো (১৭৬৬ সাল) তখন কোম্পানী পূর্ব্ব চুক্তি সংশোধন করে নতুন নবাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে নবাবের বৃত্তি স্থির করলো বাৎসরিক মোট একচল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশো একত্রিশ টাকা ন' আনা। এবারও টাকা ভাগ করে দেওয়া হলো অর্থাৎ নবাবের জন্য সতের লক্ষ আটাত্তর হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা একআনা অপরিবর্ত্তিত থাকলেও নবাবের অনুচর তথা রক্ষীবাহিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হলো চব্বিশ লক্ষ সাত হাজার দুশো সাতাত্তর টাকা আট আনা মাত্র। এবারও চুক্তির সর্ত্ত একই থাকলো—এই বৃত্তির টাকা কোম্পানী নবাবকে দিতে বাধ্য থাকবে চিরদিন।

১৭৭০ সালের প্রথম দিকে সৈফুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। এবার নবাব হলো তার বৈমাত্রেয় ভাই মাত্র ন' বছরের মোবারকদ্দৌলা। অভিভাবিকা হলো বিমাতা মণিবেগম। নতুন এই নাবালক নবাবের

সঙ্গে আবার নতুন চুক্তি হলো কোম্পানীর। চুক্তির সব সর্ত্তই থাকলো পূর্ব্ববৎ। শুধু নবাবের বৃত্তি কমিয়ে দিয়ে ধার্য্য করা হলো একত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার ন'শো একানব্বই টাকা ন আনা। সঙ্গে সেই পুরনো আশ্বাস—কোম্পানী এই বার্ষিক বৃত্তি চিরদিন দিতে বাধ্য থাকবে। নাবালক নবাব, রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। চুক্তি কি তাই সে জানে না। অভিভাবিকা মণিবেগমই নবাবের বকলমে কাজ চালায়। ইংরেজের মিষ্টি কথায় অনেক যাহু। তাই নবাব আর মণিবেগম উভয়েই এই চুক্তিতে রাজী হয়ে যায়। অবশ্য রাজী না হয়েও উপায় ছিল না। কারণ নবাবীটা তখন পুরোপুরি নির্ভর করে কোম্পানীর দয়ায়।

১৭৭২ সালে হঠাৎ কোম্পানী নিজেদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা জানিয়ে এবং নবাব নাবালক কাজেই তার খরচ খরচাও কম ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে নবাবের বার্ষিক বৃত্তি আরও কমিয়ে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট করে দিলো যোল লক্ষ টাকা। এটাও একটা চুক্তি। কোম্পানী নবাবকে আশ্বাস দিয়ে জানালো—এই বৃত্তি কমিয়ে দেওয়াটা নিছক একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। নবাব নাবালক থাকাকালীন তাকে এই টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে বটে, তবে নবাব সাবালক হওয়া মাত্র কোম্পানী ১৭৭০ সালের চুক্তি অনুসারে আবার পুরো একত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার ন'শো একানব্বই টাকা ন' আনাই দেবে। কোম্পানী বেইমান নয়, সে তার কথার মর্যাদা অবশ্যই রাখবে। কোম্পানীর এই বিনীত আশ্বাস পেয়ে প্রস্তাব মেনে নিলো নাবালক নবাব আর তার অভিভাবিকা মণিবেগম।

পরবর্ত্তীকালে নবাব সাবালক হওয়ার পর বারংবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কিন্তু নবাবের বার্ষিক বৃত্তি যোল লক্ষ টাকা থেকে বাড়ানো হয়নি। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও

কোম্পানীর কাছে সাড়া পাওয়া যায় নি। সোজা কথায়—কোম্পানী চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করেছে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হয়েছিলো তার কোনটিতেই কোম্পানীকে একতরফাভাবে নবাবের বৃত্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কোম্পানী এবং নবাব উভয়ের সম্মতিক্রমে বৃত্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোম্পানী একক-ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃত্তির টাকা কমিয়ে দিয়েছিলো। কারণ নবাবের তখন কোন ক্ষমতাই ছিল না। পক্ষান্তরে কোম্পানী ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী তথা নবাবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা। আর এই কারণেই নবাবের বৃত্তি কম করতে সক্ষম হয়েছিলো কোম্পানী।

১৭৬৫ থেকে ১৭৭১ সাল—এই ছ'বছরের মধ্যেই নবাবের বার্ষিক বৃত্তি তিপান্ন লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে করা হলো ষোল লক্ষ টাকা। ঐ ছ'বছরের মধ্যে মসনদে এসেছে পর পর তিন জন নবাব। বৃত্তির টাকায় তারা প্রত্যেকেই বিলাস বৈভবের মধ্যে মহাসুখে জীবন যাপন করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। দেশের কথা চিন্তা করার চেয়ে হারেমে বসে দিন যাপন করা অনেক আনন্দের। নবাবী মানেই ভোগ আর বিলাসিতা। মোগল যুগের এই রীতি থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবরা মুক্ত হতে পারেনি। ইংরেজ কিন্তু অনেক চতুর, বুদ্ধিমানও বটে। ভোগ বিলাসিতায় তারাও কম যায়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা করায়ত্ত করেছে শক্তি। এরই ফাঁকে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে ভুল করেনি কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা। দ্বৈতশাসনের মুল চেহারাটা ছিল এই রকমই।

মোবারকদ্দৌলার পর এক একজন এসেছে। মসনদে বসেছে। নবাবী করেছে নামেই। টাকার জন্য দরবার করেছে বিদেশী ইংরেজের

কাছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মাশুল গুনেছে তার বংশধরেরা।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে ইংরেজের একজন করে প্রতিনিধি থাকতো। একে বলা হতো রেসিডেণ্ট। নবাব এবং কোম্পানীর মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিল রেসিডেণ্ট। সে সময় এই পদ ছিল খুব লোভনীয়। পদমর্য্যাদায়, ক্ষমতায় এবং সম্মানেও রেসিডেণ্ট প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বলে গণ্য হতো। নবাবের পাওনা টাকাকড়ি কোম্পানী পাঠাতো রেসিডেণ্টের মারফৎ। তাছাড়া নরাবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিষ-পত্রও কেনাকাটা করতো রেসিডেণ্ট। পছন্দসই জিনিস পেলেই নবাব সন্তুষ্ট। দামের কথা জানার তার প্রয়োজন নেই। কারণ সেটাই নবাবী রীতি। ফলে এই সব লেনদেন তথা কেনাকাটার মাঝে নানা ফাঁক দিয়ে রেসিডেণ্টের হাতেও আসতো বেশ মোটা টাকা। উইলিয়াম হিকির ভাষায়—'a considerable portion of it always stuck to his fingures.'

রেসিডেণ্টের পদ এমনই লোভনীয় ছিল যে কেউই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই পদ ছেড়ে যেতে বা অবসর নিতে চাইতো না। ১৭৮৪ সালে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট জন্ ডায়িলি, পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট রবার্ট পটের কাছ থেকে অগ্রিম তিন লক্ষ সিক্কা টাকা নিয়ে তবেই রেসিডেণ্টের পদ থেকে সরে যেতে রাজী হয়।

খরচপত্রের মোটামুটি একটা হিসাব রাখতো রেসিডেণ্ট। বলা বাহুল্য, এই হিসাব মোটেই সঠিক থাকতো না।

বার্ষিক বৃত্তির টাকা কমে যাওয়ায় এবং নবাবের তথা নিজামতের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খরচের হিসাব সঠিক না থাকায় নবাবের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। শুধু তাই নয়, এর ফলে নবাবের দেনাও বৃদ্ধি পায়

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে মণিবেগমের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা। নবাব পরিবারের আরও কয়েকজনের এ রকম বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। এই সব বৃত্তি এবং পরিবারের আশ্রিতদের ভাতার টাকা নবাবের বার্ষিক বৃত্তি ষোল লক্ষ টাকার মধ্যে থেকেই দেওয়া হতো। অর্থাৎ নিজামতের সদস্যদের বৃত্তি এবং ভাতার টাকা, নবাবের বার্ষিক বৃত্তির টাকার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ছিল। সদস্যদের ভাতা এবং বৃত্তির টাকা দেওয়ার পর যে টাকাটা থাকতো সেটাই ছিলো নবাবের নিজস্ব খরচের টাকা।

নবাব পরিবারের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে খরচও বেড়েছে। অথচ আয় বাড়েনি। বৃত্তির টাকায় খরচ চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে অনিবার্য ভাবেই দেনা বৃদ্ধি পেয়েছে। নবাবের বিপুল দেনা পরিশোধের জন্য ১৭৯০ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রস্তাব করলো—নবাব নাজিম তার বার্ষিক বৃত্তি থেকে বছরে দু লক্ষ টাকা দেনা শোধ করবে। কিন্তু তখন নবাবের নিজস্ব খরচ বাৎসরিক প্রায় বারো লক্ষ টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের বৃত্তি ও ভাতা বাবদ দিতে হয় প্রায় চার লক্ষ টাকা। কাজেই দেনা শোধ করার মতো কোন টাকা নবাবের হাতে থাকে না।

এই সুযোগে গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করলো—নিজামত পরিবারের সদস্যদের ওয়ারিশ বা আত্মীয়রা বৃত্তির টাকা উত্তরাধিকার সুত্রে পাবে, কিন্তু আশ্রিতদের ভাতার টাকা আংশিক অথবা সম্পূর্ণটা, নবাব ইচ্ছামত দিতে অথবা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। এ বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকলে গভর্ণর জেনারেলকে জানাতে হবে। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো নবাব নাজিম ইচ্ছে করলে আশ্রিতদের ভাতা আংশিক অথবা পুরোটাই প্রত্যাহার করে নিয়ে দেনা শোধ করতে পারবে। নবাবের মতে—এই আদেশ বা ঘোষণা, নিজামতের বৃত্তির বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলের প্রথম হস্তক্ষেপ।

১৮০২ সালে নিজামতের পরিচালন ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলি একটা কমিটি গঠন করলো। বলা হলো—এই কমিটি নবাব নাজিম এবং মণিবেগমের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করে কমিটি প্রস্তাব করলো—নবাব নাজিমের দেনা, প্রাসাদের খরচ, বিবাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে সরকার যে ঋণ দিয়েছে তা পরিশোধ করার জন্য, মণিবেগমের মৃত্যুর পর তার বৃত্তির বাৎসরিক এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা নিয়োগ করা হোক্।

১৮১৩ সালে মণিবেগম মারা যায়। তিন বছর পর ১৮১৬ সালের ২৫ শে মার্চ্চ, মিঃ এডমনষ্টোন, তার প্রতিবেদনে নিজামতের ব্যবস্থাপনায় যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবের কথা উল্লেখ করে নিজামতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ছত্রিশ হাজার টাকা বেতনে একজন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করলো। ঐ প্রতিবেদনে বলা হলো এই কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য নবাবকে কোন আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হবে না, কারণ নবাব পরিবারের মৃত সদস্যদের lapsed stipend এর টাকা থেকেই এই বেতন দেওয়া যাবে। নিয়ম অনুসারে lapsed stipend এর সব টাকাই নবাব নাজিমের প্রাপ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই টাকা থেকেই মোটা বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব করা হলো।

১৮১৩ থেকে ১৮১৬ সাল পর্য্যন্ত মণিবেগম ও অন্যান্য মৃত সদস্যদের (প্রধানতঃ মণিবেগমের) lapsed stipend বাবদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা জমা ছিল। মিঃ এডমনষ্টোন প্রস্তাব করলো—এই পাঁচ লক্ষ টাকার সঙ্গে মণিবেগমের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (মণি মুক্তা হীরা ইত্যাদি) বিক্রি করে আরও দু লক্ষ টাকা যোগ করে মোট সাত লক্ষ টাকার একটা তহবিল গঠন করা হোক। ত বিলের উদ্দেশ্য—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বেতনের সুরাহা করা।

কোম্পানীর পার্শী ভাষার সচিব মিঃ মকটনের মাধ্যমে নবাবের কাছে তার সম্মতির জন্য প্রস্তাব পাঠানো হলো। যথাসময়ে নবাব সম্মতি দিল। সাত লক্ষ এক হাজার টাকা দিয়ে তহবিল গঠন করা হলো যার নাম—"Agency Deposit Fund" এই তহবিলের জমা টাকায় বাৎসরিক স্মুদ ধার্য্য হয় বিয়াল্লিশ হাজার ষাট টাকা। এজেন্টের বেতন বার্ষিক ছত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিলেও স্মুদ বাবদ বছরে ছয় হাজার টাকারও বেশী জমা থাকে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা নবাবকে জানালো—এই তহবিলের উদ্দেশ্য মহৎ এবং এই তহবিলের টাকা স্মুদ সহ নিজামতের অহস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি বলে গণ্য হবে এবং বাৎসরিক দেয় ষোল লক্ষ টাকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক্ এই সময় থেকেই মুর্শিদাবাদে নিজামতের ওপর খবরদারী করার জন্য প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন এজেন্টের পদ সৃষ্টি করা হলো।

১৮১৬ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত মণিবেগমের lapsed stipend বাবদ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা কালেকটরের ট্রেজারীতে জমা ছিল। এই টাকার মধ্যে থেকে ছয় লক্ষ টাকা নিজামতের হিতার্থে নিয়োগ করার ইচ্ছা জানিয়ে গভর্ণর জেনারেল ১৮২৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এজেণ্টকে চিঠি দিলো। চিঠিতে প্রস্তাব করা হলো প্রধানতঃ নবাবের প্রাসাদ (হাজারদুয়ারী) নির্ম্মান ও অন্যান্য ভালো কাজের জন্য ছয় লক্ষ টাকা নিয়োগ করে একটা স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করা হোক। এবারও নবাবকে যথারীতি আশ্বাস দিয়ে জানানো হলো—এই তহবিল পূর্ব্বের তহবিলের মতোই নিজামতের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে এবং নিজামতের কল্যাণেই নিয়োগ করা হবে। গভর্ণর জেনারেলের ভাষায়... "for the benifit of thc Nizamat and is clearly on the same terms as the Agency Deposit Fund, the inalinable property of His Highness family." তহবিলের উদ্দেশ্য...'in the first instance, to build a palace for His Highness.'

নবগঠিত এই দ্বিতীয় তহবিলের নাম 'মণিবেগম তহবিল' বা 'নিজামত জমা তহবিল'।

এই সময় নিজামতের বৃত্তিধারী মৃত সদস্যদের (যেমন মণিবেগম, বব্বু বেগম প্রভৃতি) lapsed stipend এর মোট পরিমাণ ছিল বাৎসরিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা। অন্যান্য ভাতা সরকারের অনুমোদন নিয়ে নবাব নাজিম বিলি বণ্টন করতে পারতো। ঐ তিন লক্ষ টাকা থেকে ভাতা বাবদ টাকা বাদ দিয়েও বছরে প্রায় দু' লক্ষ টাকার বেশী থাকতো। গভর্ণর জেনারেল ১৮২৩ সালে অপর একটি প্রস্তাবে নবাবকে জানালো যে lapsed stipend এর বাবদ মোট তিন লক্ষ টাকার মধ্যে থেকে বাৎসরিক দু' লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আরও একটা নতুন তহবিল গঠন করা হোক। প্রস্তাবে বলা হলো এই নতুন তহবিল বাবদ বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা হারে কালেকটরের ট্রেজারীতে জমা হবে এবং নবাব নাজিম তথা নিজামতের যে কোন আর্থিক অনটন তথা সঙ্কট সময়ে সরকার এই তহবিল থেকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে। এমন কি নতুন নবাব প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষনের খরচও সরকার বহন করবে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হলো নিজামতের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের মোকাবিলায় সরকারের হাত শক্তিশালী করার জন্যই এই তহবিল। গভর্ণর জেনারেলের ভাষায়—"...to place in the hands of Government a means for relieving any exigencies in which the family might be involved."

নবাবকে জানানো হলো—নবাব যদি এই প্রস্তাবে রাজী হয় তবে নবাবের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা বা কোনভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার বিরত থাকবে। গভর্ণর জেনারেল আশ্বাস দিয়ে আবার জানালো—এই তহবিলও নিজামতের সম্পত্তি এবং নিজামতের

কল্যাণেই এর সৃষ্টি এবং বার্ষিক দু'লক্ষ টাকার বেশী কোন কারণেই এই তহবিলে নিয়োগ করা হবে না।

১৮২৯ সালের ২৯শে মে, কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ এই প্রস্তাব অনুমোদন করলো। গঠন করা হলো তৃতীয় তহবিল যার নাম —lapsed stipend or Nizamut Pension Fund.

এইভাবে প্রধানতঃ মণিবেগমের lapsed stipend এর টাকা থেকেই তিনটি স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করা হয়েছিলো।

নিজামত সদস্যদের সকলের বৃত্তির টাকা সমান ছিল না। যেমন মণিবেগম যে টাকা বৃত্তি পেতো তার চেয়ে অনেক কম পেতো বব্বুবেগম। নবাবের সঙ্গে গভর্ণর জেনারেলের আলোচনার পর সদস্যদের বৃত্তির পরিমাণ স্থির করা হতো। যদিও চুক্তি অনুসারে বৃত্তির পরিমাণ স্থির করার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল নবাব নাজিমের।

আগেই বলেছি নিজামতের একটা স্বতন্ত্র ট্রেজারী ছিল। নিজামতের পুরো বৃত্তির টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিতো নবাব নাজিম এবং সম্পূর্ণ টাকাটাই নিজামত ট্রেজারীতে জমা হতো। বৃত্তি বা ভাতা যারা পেতো তারা সরাসরি নিজামত ট্রেজারী থেকে টাকা নিতে পারতো। কোন প্রাপকের মৃত্যু হলে নবাব নাজিম ইচ্ছানুযায়ী সেই বৃত্তির অথবা ভাতার টাকা মৃতের উত্তরাধিকারী বা পোষ্যকে দিতে পারতো অথবা পুরো টাকাটাই নিজামতের তথা নাজিমের সম্পত্তি বলে গণ্য করতে পারতো। অর্থাৎ চুক্তি অনুসারে এ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা ছিল নবাব নাজিমের। কাগজে কলমে এই ক্ষমতা থাকলেও কার্য্যতঃ নবাব স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। নবাবের প্রতিটি সিদ্ধান্তেই এজেন্টের অনুমোদন ছিল অত্যাবশ্যক।

হুমায়ুন জা নাবালক থাকাকালীন মসনদে বসে। ঐ সময় তার অভিভাবকত্ব তথা নিজামতের দেখাশোনার ভার ছিল গভর্ণর জেনারেলের

এজেণ্টের ওপর। যা কিছু খরচ সবই হয়েছে এজেণ্টের মারফৎ। এই সময়ের খরচ খরচার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। এজেণ্ট যে হিসাব দাখিল করেছিলো তা যথেষ্ট অস্পষ্ট এবং গোলমেলে। ফলে নবাবের কাছে সে হিসাব সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। এই সময়েই নবাবের খরচ বেশী দেখিয়ে নবাবের নামে প্রচুর দেনা দেখানো হয় এবং পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব সর্ত্ত লঙ্ঘন করে কোর্ট অফ ডিরেকটরের ১৮৩৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ৪০ নং পত্রের আদেশ অনুযায়ী, নিজামত তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা থেকে দেনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা হয়। শুধু তাই নয়, নিজামতের কাজকর্ম্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার বিরত থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেলো নিজামতের প্রতিটি কাজে এজেণ্ট ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। তিন টাকা বেতনের একজন নোকরকে ছাঁটাই করার অথবা কয়েকটি পুরনো বিবর্ণ মণিমুক্তা বিক্রি করার ক্ষমতাও নবাবের ছিল না। যে কোন কাজেই এজেণ্টের অনুমোদন নিতে হতো।

এই সময় ক্যাপ্টেন থরসবি প্রস্তাব দিলো যে, বৃত্তির টাকা বিলি বণ্টন করা হোক্ এজেণ্টের মারফৎ এবং ষোল লক্ষ টাকা থেকে সদস্যদের বৃত্তির টাকা বাদ দিয়ে বাকী সবটাই নবাবকে দেওয়া হোক্ এবং এর জন্য নবাবকে কোন রকম হিসাব দাখিল করতে হবে না। এই প্রস্তাবে নবাব সম্মতি দিলো ১৮৩৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। স্যর চার্লস মেটকাফ্ নবাবকে জানালো—"the Agent Governor General has been directed to consider it as the rule under which Nizamat affairs are hereafter to be administered."

এই নতুন ব্যবস্থায় দেখা গেলো সদস্য ও আশ্রিতদের বৃত্তি ও ভাতা দেওয়ার পর নবাবের নিজের খরচের জন্য অবশিষ্ট থাকে বার্ষিক

সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র। নবাবের খরচের তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট নয়।

এই প্রসঙ্গে ১৮২৯ সালে (বাংলা সন ১২৩৬) নবাব পরিবারের খরচের যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে সেটি নীচে দেখানো হলো :—

নিজামতের বার্ষিক বৃত্তি	—	১৬,০০০০০ টাকা
মণিবেগমের ভাতা বাবদ		
কালেকটরের ট্রেজারীতে জমা হয়	—	১,৪৪,০০০ টাকা
নবাব মোস্তাফা খাঁকে দেওয়া হয় (বার্ষিক)		৬০,০০০ টাকা
		১৩,৯৬,০০০ টাকা
অর্থাৎ মাসিক		১,১৬,৩৩৩ টাকা

নিজামতের মাসিক খরচ :—

নিজামত সেরেস্তা	—	৩৫,৬৯২ টাকা
বাহালা	—	৩১,৪০৭ টাকা
নবাব বব্বু বেগম	—	১,৮৬৭ টাকা
কুল্লুমদান খানা	—	১২,০০০ টাকা
আম্বুর খানা	—	১,৫০০ টাকা
ইমারত	—	১,৫০০ টাকা
মুস্তিফাদিনে	—	১৫২ টাকা
এজেন্টের সেরেস্তা	—	১৬,০২২ টাকা
অন্যান্য খরচ	—	১৪,৪৭৬ টাকা
		১,১৪,৬১৬ টাকা
বাকী	—	১,৭১৭ টাকা
মাসিক মোট খরচ		১,১৬,৩৩৩ টাকা

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে খরচ খরচা বাদ দিয়ে নবাবের হাতে থাকছে মাসিক ১৭১৭ টাকা মাত্র। এই সামান্য উদ্বৃত্ত

টাকা দিয়ে অত্যাবশ্যক খরচপত্র যথা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, দান, খয়রাত, কাপড় ক্রয় ইত্যাদি করা সম্ভব ছিল না।

১৮২৩ সালের চুক্তি মতো Lapsed Stipend Fund এ দু লক্ষ টাকার বেশী জমা না হওয়ার অঙ্গীকার থাকলেও, ১৮৩৬ সালের ১লা মার্চ্চ স্যর মেটকাফ নির্দ্দেশ দিলো যে এই তহবিলের টাকা প্রতি বছরই বৃদ্ধি করা যাবে।

১৮৩৭ সালে নিজামত জমা তহবিলে প্রায় সুদ বাবদ তিন লক্ষ টাকা জমা হয়। চুক্তি অনুসারে উদ্বৃত্ত টাকা নবাবকে তো দেওয়া হলোই না উপরন্তু একটা নতুন প্রস্তাব দিয়ে জানানো হলো যে এই টাকা থেকে রাস্তা পুকুর ইত্যাদি সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ করা হবে।

এই ১৮৩৭ সালেই স্যর অকল্যাণ্ড তিনটি তহবিলকে একত্রিত করে 'নিজামত তহবিল' নামে যুক্ত করলো। ১৮৪০ সালে কোর্ট অফ ডাইরেকটরস এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ দিয়ে জানালো যে—এই তহবিলের টাকা থেকে প্রয়োজনমতো নিজামত পরিবারের যে কোন সদস্যকে অনুদান বা সাহায্য দেওয়া ছাড়াও যে কোন সদস্যের বৃত্তির পরিমাণ প্রয়োজন হলে বাড়ানো যাবে। এই সময়ের হিসাবে দেখা যায় যে নিজামতের সদস্য ও আশ্রিতদের বৃত্তি ও ভাতা বাবদ দিতে হয় বাৎসরিক প্রায় আট লক্ষ টাকা অর্থাৎ নিজামতের মোট বৃত্তির (ষোল লক্ষ টাকা) অর্দ্ধেক।

১৮৫৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এজেন্ট, গভর্ণর জেনারেলকে জানালো যে—কালেকটরের ট্রেজারীতে নিজামতের বাবদ ২৪ লক্ষ টাকা জমা পড়ে আছে। এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ দিলো না গভর্ণর জেনারেল। টাকাটা কালেকটরের ট্রেজারীতে পড়েই থাকলো।

লর্ড ডালহৌসির আমলে কার্য্যতঃ সব চুক্তির সমাধি হলো। ১৮৫২ সালের ১৫ই জুলাই লর্ড ডালহৌসি আদেশ দিয়ে জানালো

যে—নিজামত তহবিল সম্পূর্ণভাবে সরকারী সম্পত্তি এবং এই তহবিলের ওপর নবাবের কোন দাবী নাই। শুধু এটুকুই নয় ঐ আদেশে আরও বলা হলো যে এখন থেকে ঐ তহবিলের টাকা আর বিনিয়োগ করা যাবে না বা ঐ টাকা বাবদ সুদ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এখন থেকে ঐ টাকা Book Debt বলে গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ একতরফাভাবে এই আদেশ দেওয়া হয়। এই সময় থেকেই তহবিলের টাকা থেকে সবরকম সাহায্য ও অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যে উদ্দেশ্যে ও চুক্তিতে এই তহবিল গঠন করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা হয়।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কোম্পানী অত্যন্ত সুকৌশলে ধীরে ধীরে নবাবের ক্ষমতা খর্ব্ব করে সেই ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে এবং পাশাপাশি নানারকম চুক্তির মারপ্যাঁচে নবাবকে আবদ্ধ করে নবাবের বার্ষিক বৃত্তি কমিয়ে দিয়ে নিজামত তথা নবাব পরিবারকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কয়েকটি কারণের জন্য কোম্পানী এই কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলো। প্রথমতঃ আগেই বলেছি দেওয়ানী হস্তান্তরের পর নবাব কোম্পানীর হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। ক্ষমতাহীন নবাব তখন থেকেই কার্য্যতঃ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ মীরজাফরের মৃত্যুর পর যারা নবাব হয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল নাবালক নবাব। ফলে তাদের ওপর খবরদারী করার জন্য যারা এজেন্ট ছিল তারা সকলেই ইংরেজ এবং কোম্পানীর মনোনীত। নিজামতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এদের ওপর থাকলেও এজেন্টরা সেই দায়িত্ব মোটেই পালন করেনি বরং তারা কোম্পানীর স্বার্থকেই বড় করে দেখেছে। শুধু তাই নয় নিজামতের অব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য এজেন্টরা অনেকাংশে দায়ী। এজেন্টের আচরণের বিরুদ্ধে আপত্তি

জানিয়েও নবাব কিছু করতে পারেনি। সরকার এজেন্টের কাজ সমর্থন করেছে। নবাব ঘোরতর আপত্তি জানালে এজেন্টকে বদলী করা হয়েছে মাত্র। অবস্থাটা এমন ছিল যেন এজেন্টই নবাবের প্রভু তথা নিজামতের হর্ত্তাকর্ত্তা। শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা তৎকালীন এজেন্ট মিঃ টোরেন্সের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ তথা নিজামত সম্পত্তি তছরূপ করার প্রমাণ সহ লিখিত অভিযোগ করেও ফল পায়নি। নবাবের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে একাধিক এজেন্ট খরচের হিসাবে কারচুপি করেছে, নবাবের নামে ঋণের বোঝা বাড়িয়েছে এমনকি নিজের খেয়ালখুশীমতো নিজামতের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেছে।

যে চুক্তি কোম্পানী করেছে সেই চুক্তি আবার কোম্পানীই ভেঙ্গেছে। একের পর এক চুক্তি হয়েছে, আবার পরক্ষণেই সেই চুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে কোম্পানী। কারণ মুল ক্ষমতাটা ছিল তাদেরই হাতে। আর তারা জানতো, চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করলেও নবাবের কিছু করার নেই।

১৭৭০ সালের চুক্তি অনুসারে বাৎসরিক একত্রিশ লক্ষ টাকা চিরদিন নবাবকে দিতে কোম্পানী বাধ্য। ১৭৭১ সালে নাবালকত্বের অজুহাতে ষোল লক্ষ টাকা স্থির করলেও গভর্ণর জেনারেল আশ্বাস দিয়েছিলো যে নবাব সাবালক হলেই আবার একত্রিশ লক্ষ টাকাই দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তা আর দেয়নি কোম্পানী। একে সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়।

পরবর্ত্তী কালে প্রতিটি নবাব মসনদে বসেই বৃত্তি বাড়ানোর দাবীতে দরবার করেছে ইংরেজের কাছে। কিন্তু সুফল পাওয়া যায়নি।

নিজামত তহবিলের ওপর নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলো নবাব নাজিম ফেরাদুন জা। এমনকি ইংলণ্ডে গিয়ে দাবী আদায়ের দরবার করেও ফল হয়নি। ব্যর্থ নবাব ফিরে এসেছিলো

শূন্য হাতে। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৮১ সালে মাত্র দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব নাজিম উপাধি সহ সব দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো ফেরাতুন জা। এর পর থেকেই নবাব নাজিমের পরিবর্ত্তে নবাব বাহাতুর অফ মুর্শিদাবাদ। বার্ষিক বৃত্তি ষোল লক্ষ টাকা থেকে তু'লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। রিয়াসতির শেষ কাগজে কলমে ১৮৮১ সালেই।

সোজা হিসাবে দেখা যায় ১৭৭১ থেকে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত এই একশো দশ বছরে প্রতি বছর পনের লক্ষ টাকা হিসেবে মোট ষোল কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (সুদ বাদে) নবাবকে দেয়নি কোম্পানী। ১৭৭০ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী এই টাকা নবাব নাজিমের ন্যায্য প্রাপ্য।

নিজামত তহবিলের হিসাবে দেখা যায় যে Agency Deposit Fund বাবদ সাত লক্ষ টাকা, মণিবেগম তহবিল বা নিজামত জমা তহবিল বাবদ ছ' লক্ষ টাকা এবং Lapsed Stipend Fund বাবদ ১৮২৩ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত (যেদিন এই টাকা সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষিত হলো) একত্রিশ বছরে বাৎসরিক তু'লক্ষ টাকা হিসেবে মোট বাষট্টি লক্ষ টাকা একুনে সর্ব্বমোট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা কোম্পানী দেয়নি নবাবকে। শুধু আসল টাকার কথাই এখানে বলা হয়েছে। আসল টাকার সুদ এবং সুদের ওপর সুদের টাকার হিসাব ধরলে এই টাকার অঙ্ক অনেক বেড়ে যাবে। এ ছাড়াও নিজামতের নিজস্ব সম্পত্তি মণি মুক্তা ইত্যাদি বিক্রির টাকাও এখানে দেখানো হয়নি কারণ তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

তুর্ভাগ্য নবাবের। তুর্ভাগ্য নিজামতের। তুর্ভাগ্য দেশের। খাল কেটে কুমীর এনেছিলো মীরজাফর। তাকে সাহায্য করেছে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী। শুধু ক্ষমতার লোভে। ক্ষমতা কতোটা

তারা পেয়েছিলো জানা যায় না, শুধু জানা যায় বিদেশী বণিক শাসন করেছে এ দেশ। নবাব সেখানে গৌণ। ভাগ্য ফিরেছে বিদেশী বণিকদের। শূন্য হাতে যে এসেছিল সেও দেশে ফিরে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে। শোষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে নিজামতের বনেদীয়ানা, জৌলুষ তথা গৌরব।

পূর্ব্বসূরীদের কৃতকর্ম্মের মাশুল গুণেছে ভাবী বংশধরেরা প্রায় নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে॥

বড়নগর

মুর্শিদাবাদের বারাণসী

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে আজিমগঞ্জের এক মাইল উত্তরে বড়নগর। অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদাবাদের বারাণসী। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বড়নগর।

পূর্ব্বে বড়নগর ছিল রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্গত এবং তখন এখানেই ছিল জমিদারীর সদর দপ্তর। সে সময় বড়নগর প্রধানতঃ একটা প্রসিদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। এখানে কয়েক হাজার কাঁসারীর বাস ছিল। তৈরী হতো উচ্চমানের পিতল কাঁসার বাসন। বড়নগরে তৈরী পিতলের ঘড়ার (কলসী) নামডাক ছিল খুবই বেশী। এইসব বাসনপত্র এখান থেকে তৈরী হয়ে চালান হতো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

রাজা উদয়নারায়ণের পর রাজসাহী জমিদারীর মালিক হয় নাটোর রাজবংশ। এই রাজপরিবার ছিল মৈত্র বংশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব মৈত্র রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়া রাজার অধীনে কাজ করতো। কামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন খুবই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিল। তার কর্ম্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা দর্পনারায়ণ তাকে ঢাকায় নবাব দরবারে পুঁটিয়া রাজের উকিল নিযুক্ত

করে। এই কাজে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। পরে সে কাননগো দপ্তরে সহকারীর কাজ পায় এবং ক্রমে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতায় কাননগো পদে উন্নীত হয়।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে দেওয়ানীর সদর দপ্তর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়, এবং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নতুনভাবে জমি জরীপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। এই সময় রঘুনন্দনও মুর্শিদাবাদে আসে এবং জমি জরীপ, বন্দোবস্ত তথা জমিদারীর অন্যান্য কাজে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। নিজস্ব কর্ম্মনৈপুণ্যে রঘুনন্দন অল্প সময়ের মধ্যেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে।

নতুনভাবে রাজস্ব নিরূপণ ও জমি বন্দোবস্তের ফলে বকেয়া রাজস্বের দায়ে অনেক রাজা ও জমিদার তাদের বহু মূল্যবান ভূসম্পত্তি হারায়। এই সুযোগে রঘুনন্দন তার বড় ভাই রামজীবনের নামে অনেক জমিদারী গ্রহণ করে। ১৭০৬ সাল থেকেই রামজীবনের নামে জমিদারী গ্রহণ শুরু হয়। এইভাবে বনগাছি ও ভাতুরিয়া জমিদারী এবং সীতারাম রায় (যশোর) এর বিপুল সম্পত্তির মালিক হয় রামজীবন। তবে রাজা উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজসাহী জমিদারীর মালিকানা পেয়ে রামজীবন তৎকালীন বাংলার একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা বলে গণ্য হয়। সমস্ত সম্পত্তিই রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্গত হয়। এই বিশাল জমিদারী বাহান্ন লক্ষ টাকার এষ্টেট্ বলে গণ্য হতো। এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিল রঘুনন্দন ঠিকই, কিন্তু রামজীবনের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও পরিচালন ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে তার সুযোগ্য দেওয়ান দীঘাপতিয়া রাজবংশীয় দয়ারাম রায়ের কর্ম্মদক্ষতা এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর উন্নতির সহায়ক হয়।

১৭১৪ সালে রঘুনন্দন মারা যায়। রামজীবনের ছেলে কালিকাপ্রসাদ

রামজীবনের জীবদ্দশায় মারা যাওয়ায় রামকান্তকে দত্তক নেয় রামজীবন। ১৭৩০ সালে রামজীবনের মৃত্যুর পর এই বিশাল জমিদারীর মালিকানা পায় রামকান্ত। রামকান্তর স্ত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী। রাজসাহী জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা রাণী ভবানী।

রামকান্ত ছিল সৎ, ধার্ম্মিক এবং উদার। অভিজ্ঞ দেওয়ান দয়ারাম জমিদারীর সব কাজ পরিচালনা করতো। তার সুব্যবস্থাপনায় রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত জমি বন্দোবস্তের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

১৭৪৮ সালে মারা যায় রামকান্ত। রাণী ভবানীর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ বছর। এই সময় থেকেই জমিদারীর দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় রাণী ভবানী নিজেই জমিদারীর কাজ দেখাশুনা করেছে। প্রজাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করেছে। দুঃস্থ, দরিদ্র জনগণকে অকাতরে সাহায্য করেছে। জনগণের সুবিধার্থে তৈরী করে দিয়েছে রাস্তা, পুষ্করিণী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের প্রতি রাণী ভবানীর সাহায্য দানের তুলনা পাওয়া যায় না।

বহু ধার্ম্মিক হিন্দু এবং মুসলমানকেও নিষ্কর জমি দান করেছে রাণী ভবানী। বড়নগর, ভবানীপুর, বেনারস ও নাটোরে তৈরী করেছে বহু দেবমন্দির। এই সব মন্দিরের পরিচালনার জন্য দান করেছে প্রচুর ভু-সম্পত্তি। পূজা-পাঠ-অর্চ্চনা এবং জনসেবাই ছিল রাণী ভবানীর জীবনের ব্রত।

দান ও বদান্যতার জন্য এই হিন্দু রমণী ইতিহাসে চিরস্মর হয়ে থাকবে। জমিদারীর মোট আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। এর থেকে রাজস্ব বাবদ দেওয়া হতো সত্তর লক্ষ শিক্কা টাকা। বাকী প্রায় সব টাকাই খরচ করা হতো জনকল্যাণে। এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর

আয়তন ও রাজস্ব সম্পর্কে হলওয়েল সায়েব বলেছে—they possess a tract of country about thirty-five days' travel and under a settled Government ; their stipulated annual to the crown was seventy lakhs of Sicca rupees, the real revenues about one crore and a half."

হেষ্টিংস সায়েব বলেছে—মর্য্যাদার দিক থেকে বাংলায় রাজসাহী জমিদারীর স্থান দ্বিতীয়।

রাণী ভবানীর একমাত্র মেয়ে তারাসুন্দরীর বিয়ে হয় রাজসাহী জেলার খাজুরাই গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। ভবানীর ইচ্ছে ছিল—রঘুনাথের হাতে জমিদারীর ভার অর্পণ করে, বাকী জীবনটা দেবদেবীর পূজা ও অর্চনায় অতিবাহিত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। অল্প বয়সে বাংলা ১১৫৮ সনে রঘুনাথ মারা যাওয়ায় বালবিধবা তারাসুন্দরীকে নিয়ে রাণী ভবানী বড়নগরে বাস করতে শুরু করে এবং এখান থেকেই জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করে।

তারাসুন্দরীর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসও এ বিষয়ে নীরব। বিশেষতঃ তারাসুন্দরীর বাল্য জীবন ও শেষ জীবনের কাহিনী আজও অন্ধকারে।

শোনা যায়—রাণী ভবানী যখন বালবিধবা তারাসুন্দরীকে নিয়ে বড়নগরে বাস করতো, সে সময় তারাসুন্দরীর রূপ ও যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করার চেষ্টা করে সিরাজ। কোন কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। বড়নগরে স্থানীয় অনেকের মুখে আজও এই ঘটনার কথা শোনা যায়। তবে এ ঘটনার কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলেছে—একদিন অপরাহ্নে তারাসুন্দরী যখন একাকী

মন্দির প্রাঙ্গনে (কারও কারও মতে—রাজপ্রাসাদের ছাদে) পদচারণা করছিলো সে সময় ভাগীরথীবক্ষে ইয়ারবন্ধুসহ সিরাজ নৌকাবিহার করার সময় দূর থেকে তারাসুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয় এবং প্রথমে তাকে নিজের কাছে আনার উদ্দেশ্যে পাইক বরকন্দাজ পাঠায়। পরে সিরাজ নিজেই বড়নগরে যায়। রাণী ভবানী সিরাজের অসৎ উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ সাধকবাগ আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা মস্তারাম আউলিয়ার শরণাপন্ন হয়। প্রবাদ—সিরাজ বড়নগরে আসার পূর্ব্বেই মস্তারামের অলৌকিক ক্রিয়ার ফলে রূপসী তারাসুন্দরী হঠাৎ কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ মহিলার রূপ ধারণ করে এবং তারাসুন্দরীর ঐ অবস্থা দেখে সিরাজ তার অভিপ্রায় ত্যাগ করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। সিরাজ চলে যাওয়ার পরই মস্তারামের মন্ত্রবলে তারাসুন্দরী আবার পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেছে—মস্তারাম মন্ত্রবলে বৈষ্ণব সৈন্য সৃষ্টি করে এবং তারাই সিরাজকে ও তার পাইক বরকন্দাজদের বাধা দিয়ে হটিয়ে দেয়। আবার এ ছাড়া এমনও শোনা যায় যে—সিরাজের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে রাণী ভবানী কৌশলে রটনা করে দেয় যে তারাসুন্দরী হঠাৎ মারা গেছে এবং সেই রটনা সত্য বলে প্রমাণ করতে ভাগীরথী তীরে মহাসমারোহে কল্পিত দাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এই সব রটনার কোনটা সত্য অথবা কতোটা সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তারাসুন্দরীর প্রতি সিরাজের আকৃষ্ট হওয়ার কথা অনেকেই স্বীকার করেছে।*

অল্পবয়সে রঘুনাথ মারা যাওয়ায় বাধ্য হয়েই রাণী ভবানীকে আবার জমিদারী পরিচালনার কাজ করতে হয়েছে। এই সময় তাকে

* Serajudaula aspired to Tara's love is a fact well known to readers of history, but it is needless to repeat the unpleasant story here.—H. C. Moitra

নানারূপ বাধাবিঘ্নর সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তার বিপক্ষে কাজ করেছে। এমনকি মহারাজ নন্দকুমারও রাণী ভবানীর বিরোধিতা করেছে। রঘুনাথ মারা যাওয়ার পর (১৭৫১-৫২ সাল) মহারাজ নন্দকুমার রাণী ভবানীর হাত থেকে জমিদারীর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাণী তার বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারামের সহযোগিতায় জমিদারী রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

রঘুনাথের মৃত্যুর পর রাণীভবানী দত্তক নেয় রামকৃষ্ণকে। কিন্তু রামকৃষ্ণ ছিল কালী সাধক। অধিকাংশ সময় সে মগ্ন থাকতো দেব-দেবীর সাধনায়। জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করতে সে খুব আগ্রহী ছিল না। ফলে উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে জমিদারীর ক্ষতি হয়। যশোরের ভূষণা মহল রামকৃষ্ণর আমলে বেহাত হয়ে যায়। এছাড়াও তার আমলেই অনেক মুল্যবান সম্পত্তি নীলামে হস্তান্তরিত হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে—রাজসাহী জমিদারী বিনষ্ট হওয়ার মূল কারণ—রামকৃষ্ণর অযোগ্যতা এবং অপদার্থতা।

ইতিপূর্ব্বে রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্গত রংপুরের বাহারবন্দ মহাল হেষ্টিংসের আনুকুল্যে ও সহযোগিতায় তার বেনিয়ান কান্তবাবু (কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) বেনামীতে কিনে নেয়। প্রধানতঃ এই ঘটনাই রাজসাহী জমিদারীতে ভাঙ্গনের সূচনা করে। পরবর্ত্তীকালে রামকৃষ্ণর অমনযোগিতা ও শৈথিল্যের ফলে এই বিস্তীর্ণ জমিদারী নানাভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। শেষের দিকে রাণী ভবানী আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই ভাঙ্গন রোধ করতে পারেনি ।

বাংলা ১২০৩ সনে রামকৃষ্ণ মারা যায়। বড়নগরে ১৮০২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর (১২০৯ সনের ভাদ্র মাসে) রাণী ভবানী দেহত্যাগ করে।

বড়নগরে রাণী ভবানী বাস করেছে দীর্ঘদিন। তার কোন কোন কীর্ত্তি

বড়নগরে আজও বর্ত্তমান। এই আমলেই এখানে গড়ে ওঠে একাধিক মন্দির। যার ফলে বড়নগরকে বলা হতো 'মুর্শিদাবাদের বারাণসী'। জমিদারীর মোট আয়ের অর্দ্ধেক রাজস্ব বাবদ দেওয়া হতো একথা আগেই বলা হয়েছে। বাকী অর্দ্ধেক টাকার অধিকাংশই রাণী ভবানী ব্যয় করেছে দানে এবং পূজা, উৎসব ইত্যাদি পুণ্যকাজে।

বড়নগরে রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর মন্দিরটি সবচেয়ে বড়। অষ্টকোনাকৃতি এই মন্দিরগাত্রে চূণ ও বালির অপূর্ব্ব শিল্পকর্ম্ম আছে। মন্দিরের মধ্যে বিশাল শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান।

বড়নগরে চারবাংলা মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্ম্মও দর্শনীয়। আঠারো শতকের স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইঁটের ওপর খোদাই করা দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, রামায়নের যুদ্ধ ইত্যাদি। চারবাংলা মন্দির—মোট চারটি মন্দিরের সমষ্টি। উত্তর ও পশ্চিম-দিকের মন্দির দুটিতে টেরাকোটার কাজ দেখা যায়। পূর্ব্বদিকের মন্দিরে চূণ ও বালির চমৎকার শিল্পকর্ম্ম আছে। দক্ষিণদিকের মন্দিরে কোন শিল্পকর্ম্ম নেই। সম্ভবতঃ ঐ একটি মন্দির কোন কারণে অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। প্রতিটি মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে।

ভবানীশ্বর মন্দিরের পশ্চিমদিকে ছিল রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দির। কালো পাথরের অপূর্ব্ব গোপালমূর্ত্তি ছিল। মন্দিরের দেওয়ালে চূণের (পঙ্খের) সুন্দর কারুকার্য্য ছিল। মন্দিরটি বর্ত্তমানে ধ্বংসাবস্থায়। মদনগোপাল মন্দিরটিও প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মদনগোপালের সুন্দর দারুমূর্ত্তি একটি অন্য ঘরে রক্ষিত আছে। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের অষ্টধাতুনির্মিত রাজরাজেশ্বরী, জয়দুর্গা এবং করুণাময়ীর পৃথক পৃথক তিনটি বিগ্রহ আজও আছে। এখনও এই বিগ্রহগুলির নিয়মিত পূজা হয়।

এখানে একটি কালো পাথরের ওপর খোদাই করা সুন্দর

বরাহমূর্ত্তি আছে। এটি সম্ভবতঃ পালযুগের। খৃষ্টিয় দশম অথবা একাদশ শতকের মূর্ত্তি বলেই মনে হয়।

এসব ছাড়াও রাজবাড়ীর অদূরে ছিল গণেশ মন্দির। সেখানে ছিল অষ্টভুজ গণেশের পাষানমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিকে গ্রাম্যদেবতারূপে পূজা করা হতো। সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিগ্রহটিও চুরি হয়ে গেছে।

মঠবাড়ীর উত্তরদিকে ছিল দয়াময়ী মন্দির। সেখানে ছিল পাষানকালীর সুন্দর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিও পরবর্ত্তীকালে অপহৃত হয়। প্রবাদ—নিকটস্থ কোন পুকুর খনন করার সময় এই মূর্ত্তি আবিষ্কার করা হয়েছিলো। এছাড়াও ছিল একটা কালীমূর্ত্তি। গঙ্গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এই কালীমূর্ত্তি।

অদূরে জোড়বাংলা মন্দিরের শিল্পকর্ম্মও দর্শনীয়। ইঁটের ওপর খোদাই করা নানা মূর্ত্তি উন্নত শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় বহন করছে আজও।

বড়নগরে আজও আছে রাণী ভবানীর সাধকপুত্র রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এখানে বসেই রামকৃষ্ণ সাধনা করতো প্রতিদিন।

উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে বড়নগরের মন্দিরগুলি বর্ত্তমানে জীর্ণদশায়। তবু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে বড়নগর তীর্থস্বরূপ। দর্শকদের কাছে বড়নগরের আকর্ষণ দুর্নিবার।।

—

কর্ণসুবর্ণ

রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার

মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন স্থান—রাঙামাটি। বহরমপুর থেকে প্রায় সাত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তে এর অবস্থান। এই অঞ্চলের মাটির রং ঈষৎ লাল এবং ভূমি অসমতল। অসংখ্য মাটির ঢিবি, উঁচুনীচু ভূভাগ, বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ইঁট পাথর এবং মৃৎপাত্রের টুকরো নিঃসন্দেহে এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এসব দৃষ্টে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় বর্ত্তমান রাঙামাটি —কোন এক সুপ্রাচীন উন্নত নগরীর ধ্বংশাবশেষ।

রাঙামাটিকে কেন্দ্র করে অতীতে অনেক গবেষণা হয়েছে। এমনকি এর প্রাচীনত্ব নির্ণয় এবং নামের উৎপত্তি নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে।

রাঙামাটির সঙ্গে কর্ণসুবর্ণ নামটিও প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রবাদ—অঙ্গরাজ দাতাকর্ণ তার পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে বিভীষণকে নিমন্ত্রণ করে এবং বিভীষণ সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে এখানে সুবর্ণ বৃষ্টি করে ফলে এখানকার মাটির রং হয় সোনার মত লাল। কেউ কেউ বলেছে—কোন এক সাধু ব্যক্তির তপস্যায় প্রীত

হয়ে দেবতারা এখানে স্বুবর্ণ বৃষ্টি করে। যাই হোক উভয় প্রবাদ বা কাহিনীতেই স্বুবর্ণ বৃষ্টির কথা স্বীকার করা হয়েছে।

রাঙামাটিই কর্ণস্বুবর্ণ কি না এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতান্তর ছিল। এই মতান্তরের মূল কারণ—চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংএর বাংলায় ভ্রমণ সম্পর্কে তার জীবনচরিত ও ভ্রমণবৃত্তান্তে পরস্পরবিরোধী তথ্য। জীবনচরিত থেকে জানা যায়—হিউয়েন সাং পণ্ড্রবর্ধন থেকে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ন'শো মিঃ পথ অতিক্রম করে কর্ণস্বুবর্ণ নগরে আসে এবং এখান থেকেই দক্ষিণ পূর্ব্ব সমতটে যায়। কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্তে কামরূপ থেকে সমতট এবং তাম্রলিপ্ত হয়ে কর্ণস্বুবর্ণে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। কানিংহামের মতে—স্বুবর্ণরেখা নদীর তীরে কর্ণস্বুবর্ণর অবস্থান ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও কর্ণস্বুবর্ণ নগরীর প্রকৃত স্থান নির্ণয়ে মত পার্থক্য ছিল। রাঙামাটি এলাকায় কর্ণস্বুবর্ণ নগরের অবস্থান বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আলোকপাত করে বেভারিজ সায়েব।

দাতা কর্ণর পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে স্বুবর্ণ বৃষ্টির প্রবাদে বিশ্বাস করলে—কর্ণ ও স্বুবর্ণ এই দুই শব্দের সমন্বয়ে কর্ণস্বুবর্ণ নাম হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ কর্ণস্বুবর্ণকে বলেছে কানসোনা। লেয়ার্ড সায়েব বলেছেন কানসোনাপুরী। কারও কারও মতে—কর্ণস্বর্ণ। বলা বাহুল্য এ সব নামই, কর্ণস্বুবর্ণ নামের অপভ্রংশ মাত্র।

রাঙামাটি থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নানারূপ প্রত্ন উপকরণ (যথা মুদ্রা, মূর্ত্তি, মৃতপাত্রর টুকরো ইত্যাদি) দৃষ্টে অতীতে অনেকেই অনুমান করেছে যে এ অঞ্চলেই কর্ণস্বুবর্ণ নগরীর অবস্থান ছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকল্পে ১৯২৮-২৯ সালে সর্ব্বপ্রথম এই অঞ্চলের রাক্ষসী ডাঙ্গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য শুরু হয়। কিন্তু প্রাচীন কর্ণস্বুবর্ণ নগরীর পরিচয়জ্ঞাপক কোন প্রামাণ্য

তথ্য সে সময় ওখানে পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে—"no definite information is available about its identity with Karnasuarna Vihara."* যার ফলে ঐ অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দেয়। পরে ১৯৬২ সালে রাজবাড়ী ডাঙ্গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য শুরু করে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যাপক বসতির চিহ্নসহ বৌদ্ধবিহারের ধ্বংশাবশেষ এবং প্রচুর পরিমান প্রত্ন উপাদান। এই সব ধ্বংসস্তুপ ও প্রত্নউপকরণ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে হিউয়েন সাং বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারটি রাজবাড়ী ডাঙ্গাতেই অবস্থিত ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় ছিল কর্ণসুবর্ণ নগরীর অবস্থান।

নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বনাম ছিল চিরুটি। সম্প্রতি ঐ নাম বাতিল করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে—কর্ণসুবর্ণ। রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ হওয়ায় সম্ভবতঃ রাজ্যের নামও ছিল কর্ণসুবর্ণ।

সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন রাজ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা বলেছে। ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন বলতে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের কথাই এখানে বলা হয়েছে। হিউয়েন সাং তার পশ্চিম দেশীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানীর পাশেই লো-টো-মো-চী নামে একটি সঙ্ঘারাম দর্শনের কথা উল্লেখ করেছে। লো-টো-মো-চী, রক্তমৃত্তির চৈনিক আকার। সুতরাং লো-টো-মো-চী বা রক্তমৃত্তি বলতে রাঙামাটিকেই বোঝান হয়েছে।

কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি ছিল ৪৪৫০ লী অর্থাৎ ৮৯০ মাইল এবং রাজধানীর পরিধি ছিল ২০ লী অর্থাৎ ৪ মাইল। রাজ্যের অধিবাসীরা

*Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1928-29

ছিল শান্ত, বিনয়ী এবং ভদ্র। গৃহস্থরা সাধারণভাবে ধনশালী ছিল। রাজ্যের জনগণ বিদ্যার যথোচিত সমাদর করতো।

হিউয়েন সাং কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারাম এবং দুহাজার বৌদ্ধ শ্রমন দেখার কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও দেবমন্দির ছিল পঞ্চাশটি। রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামটি ছিল সবচেয়ে বড় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল প্রাচীন বাংলার বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। রাজ্যের বিশিষ্ট পণ্ডিতরা এখানে একত্রিত হয়ে ধর্ম্মালোচনা করতো। রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম থেকেই কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার লাভ করে। এই সঙ্ঘারাম কতো প্রাচীন সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জানা যায় যে, এক সময় দাক্ষিণাত্যের কোন এক হিন্দু পণ্ডিত তামার পাত দিয়ে উদর আবৃত করে এবং মাথায় জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হয়ে যে কোন প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানায়। তার এই অদ্ভুত সজ্জার কথা জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে অত্যধিক জ্ঞান অর্জ্জনের ফলে উদর বিদীর্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তামার পাত দিয়ে উদর আবৃত করা আছে এবং জনসাধারণকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মাথায় জ্বলন্ত মশাল বহন করা হচ্ছে।

যাইহোক দশদিন পর্য্যন্ত এই পণ্ডিতের আহবানে সাড়া দিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষপর্য্যন্ত রাজ্যের নির্জ্জন বনমধ্যে অবস্থানরত কোন এক শান্ত স্বভাব বিদ্বান শ্রমন, রাজার বিশেষ অনুরোধে, ঐ বহিরাগত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বহু তর্ক বিতর্কের পর ঐ বহিরাগত পণ্ডিত পরাজিত হয়ে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শ্রমনের কঠিন যুক্তি এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে রাজা মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয় এবং শ্রমনের অনুরোধে রক্তমৃত্তি নামে সঙ্ঘারাম তৈরী করে দেয়।

এর পূর্ব্বে এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল না।

রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব প্রচার করার ব্যবস্থা হয় এবং রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য বিস্তার করে।

রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের সন্নিকটে সম্রাট অশোক নির্ম্মিত একাধিক স্তুপ ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এ সবই জানা যায় হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব এই অঞ্চলে তথা বঙ্গদেশে এসেছিলেন কি না সে প্রশ্নে বিতর্ক আছে। কিন্তু হিউয়েন সাংএর এই বর্ণনা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয, তবে স্বীকার করতেই হবে যে খৃষ্টপূর্ব্ব কালেও কর্ণসুবর্ণ একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল।

হিউয়েন সাং বলেছে—কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে শশাঙ্ক নামে এক রাজা রাজত্ব করতো। প্রামান্য তথ্যের অভাবে বাংলার প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। রাজা শশাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে গুপ্তবংশীয় রাজা ছিল। প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ তাকে নরেন্দ্র গুপ্ত নামে উল্লেখ করেছে।

শশাঙ্ক কান্যকুব্জের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যর সমসাময়িক এবং ঐতিহাসিকদের কলমে প্রবল বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে পরিচিত। গুপ্তবংশীয় রাজারা ছিল শক্তির উপাসক। গুপ্তযুগেরর মুদ্রা দৃষ্টে একথার প্রমান পাওয়া যায়। রাঙামাটি থেকে গুপ্তযুগের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে-গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজত্ব করার কথা অস্বীকার করা যায় না। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অধিবাসীরা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

শশাঙ্ক এবং তার প্রতিষ্ঠিত গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয়—বাংলার ইতিহাসে একটা আকষ্মিক ঘটনার মতো দেখা যায়। কারণ আগেই

বলা হয়েছে যে এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রথমদিকে গৌড়রাজের অধীনে শশাঙ্ক একজন সামন্তরূপে সাহাবাদ জেলা শাসন করতো। পরবর্ত্তীকালে সে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করে এবং বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। রাজ্যবর্দ্ধনকে পরাস্ত ও নিহত করে শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করে এবং রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নী বন্দিনী রাজ্যশ্রীকে মুক্তিদান করে। রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি নিঃসন্দেহে শশাঙ্কর মহানুভবতার পরিচায়ক।

হর্ষচরিতের মধ্যযুগীয় টিকাকার বলেছে—রাজ্যবর্দ্ধনের বিশ্বাস অর্জ্জন করার জন্য শশাঙ্ক নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রলুব্ধ করে এবং রাজ্যবর্দ্ধন যখন আহারে প্রবৃত্ত ছিল তখন কৌশলে তাকে অনুচরগণ সহ হত্যা করা হয়। হর্ষচরিতে বলা হয়েছে—শশাঙ্ক মিথ্যা ভদ্র ব্যবহার দ্বারা রাজ্যবর্দ্ধনের বিশ্বাস জন্মায় এবং নিজভবনে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করে*। হর্ষের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে—রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে শত্রুভবনে গিয়ে প্রাণ হারায়। হিউয়েন সাং বলেছে—শশাঙ্কর মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্দ্ধনকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করে। বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

আগেই বলা হয়েছে যে—ঐতিহাসিকদের কলমে শশাঙ্ক প্রবল বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত হয়েছে। হর্ষচরিত প্রণেতা বানভট্ট শশাঙ্ককে বিদ্বেষবশতঃ কোন কোন সময় 'গৌড়াধম' 'গৌড়ভুজঙ্গ' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু শশাঙ্ক সত্যিই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিল কি না

* 'গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ'—হর্ষচরিত।

"(Rajyavardhana) was treacherously murdered by Sasanka, the wicked king of Karnasuvarna in Eastern India, a prosecutor of Buddhism."
—Watters-on Yuan Chwang's Travels in India, Vol. I.

সেটি বিতর্কিত প্রশ্ন। হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় শশাঙ্ক মগধ ও মিথিলায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলো। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধশ্রমন এবং বৌদ্ধবিহার থাকা সত্ত্বেও শশাঙ্ক সে সবের ক্ষতিসাধন করেছে এমন কোন তথ্য হিউয়েন সাংএর বর্ণনায় পাওয়া যায় না। হিউয়েন সাং বলেছে—শশাঙ্ক কুশীনগর থেকে বৌদ্ধভিক্ষুদের বিতাড়িত করে, পাটলিপুত্রের বুদ্ধপদচিহ্নবিশিষ্ট পাথরটি ভেঙ্গে ফেলতে ব্যর্থ হয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে, বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ উৎপাটিত করে এবং বৌদ্ধ আশ্রমগুলি ধ্বংশ করে। বোধিবৃক্ষের নিকটেই একটি বৌদ্ধবিহারে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্বংশ করে সেখানে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করতে আদেশ দেয়। এইসব ঘটনার পর শশাঙ্ক আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ে। পরবর্ত্তীকালে তার শরীরে দুরারোগ্য ক্ষত দেখা দেয়। কিছুকাল রোগভোগের পর শশাঙ্কর মৃত্যু হয়। গৌড়াধিপ শশাঙ্কর মৃত্যুর পর, তার রাজ্য সহজেই হর্ষবর্দ্ধনের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ শশাঙ্কর উত্তরাধিকারী হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব যুগেও সম্ভবতঃ রাঙামাটি কোন এক বিশিষ্ট জনপদ ছিল। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক এখানে ধর্ম্মপ্রচার করার কথা (হিউয়েন সাংএর বর্ণনা অনুসারে) আগেই বলেছি। কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্রর' 'কোষপ্রবেশ্য রত্নপরীক্ষা' অধ্যায়ে পূর্ব্বদেশে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্ররূপে 'সৌবর্ণকুড্যক' নামক এক স্থানের উল্লেখ আছে। সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে—সৌবর্ণকুড্যকই বর্ত্তমান রাঙামাটি এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে সৌবর্ণকুড্যক পরিচিত হয় কর্ণসুবর্ণ নামে।

সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে রাজবাড়ীডাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন যুগের বসতির ধ্বংশাবশেষ। এগুলির সময়কাল অনুমান

করা হচ্ছে—খৃষ্টীয় ২য় শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। ১৯৬২ সালে উৎখননের ফলে পাঁচটি বিভিন্ন পর্বে বসতির ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কার করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বসতি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্বের বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রথম পর্বের বসতি ভাগীরথীর প্লাবনে ধ্বংশ হয় এরকম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ যাবৎ উৎখননের ফলে বিভিন্ন যুগের যে সব ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে আনুমানিক ষষ্ট-সপ্তম শতকের একটি বৌদ্ধবিহারের সুগঠিত প্রশস্ত সিঁড়ি, মেঝ, বৌদ্ধস্তুপের বৃত্তাকার ভিত্তিতল প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়াও একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের আকর্ষণীয় গঠন বিন্যাস এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি. প্রশস্ত সিঁড়ির সুন্দর গঠনশৈলী প্রাচীন বঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন বলে উল্লেখ করা যায়। একটি ধ্বংশাবশেষের দেওয়ালের ভিত্তির নীচে প্রোথিত একটি নরমুণ্ড আবিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার পর জানা যায় ঐ নরমুণ্ডটি (খুলি) কুড়ি বছরের বেশী বয়সের কোন মানুষের এবং কোন তীক্ষ্ণধার সম্বলিত অস্ত্রের সাহায্যে উল্টো ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের আদলে দেহ থেকে মুণ্ডটি কাটা হয়। যে পর্বে এটি আবিষ্কার করা হয়েছে সেটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের বলে ধরা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে—তৎকালে নরবলি প্রথা হয়তো চালু ছিল এবং কোন কিছুর ভিত্তি স্থাপন করার সময় তৎকালীন সংস্কার অনুসারে হয়তো শুভপ্রতীকরূপে নরমুণ্ড প্রোথিত করার প্রথা ছিল। শুধু তাই নয় সেকালে নরমুণ্ড নিয়ে তান্ত্রিক সাধনার প্রথা চালু ছিল বলেও অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য য়ে ভিত্তির নীচে প্রোথিত নরমুণ্ড আবিষ্কার দেশের এই অঞ্চলে এটিই সর্ব্বপ্রথম বলে দাবী করা হয়েছে।

অপর একটি ধ্বংশাবশের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিরাট দগ্ধ শস্যগোলা যার মধ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমান দগ্ধ গমও ধান।

এই পোড়া খাদ্যশস্যর রেডিও কার্ব্বন পরীক্ষা করে আমেরিকার পেনিসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মিঃ লিরি বলেছেন—এই খাদ্যশস্য খৃষ্টিয় ৮ম-৯ম শতকের কোন এক সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়।

রাঙামাটি অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কষ্টিপাথরের একটি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির কথা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করে ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড। লেয়ার্ড সাহেব এই অঞ্চলে অনুসন্ধানকালে এটি আবিষ্কার করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। ১৮৫৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে এই মুর্ত্তি সম্বন্ধে লেয়ার্ড প্রথম আলোচনা করে মুর্ত্তিটির একটি রেখাচিত্র প্রকাশ করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে লেয়ার্ড উল্লেখিত সেই মুর্ত্তিটি সাটুই গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়। লেয়ার্ড বলেছে—মুর্ত্তিটি ষড়ভুজ এবং কালী মূর্ত্তি। সাম্প্রতিক উদ্ধারপ্রাপ্ত মুর্ত্তিটি পরীক্ষা করে জানা গেছে মূর্ত্তিটি ছিল অষ্টভুজ এবং মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। যাইহোক লেয়ার্ড উল্লেখিত মূর্ত্তির সঙ্গে বর্ত্তমান মুর্ত্তিটির নানারূপ সাদৃশ্য থাকায় এই মূর্ত্তিটিকেই ১৮৫৩ সালে লেয়ার্ড আলোচিত মূর্ত্তি বলে দাবী করা হচ্ছে। আলোচিত মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকের। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এতদঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন প্রত্নউপকরণ। যারমধ্যে আছে আড়াই ফুট দীর্ঘ খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দুষ্প্রাপ্য লকুলিশ মূর্ত্তি, গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব শিল্পদক্ষতার পরিচায়ক চূনবালি দ্বারা নির্ম্মিত একটি নারী মূর্ত্তির মুখ, খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের তারামূর্ত্তি ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক মূল্যবান প্রত্নউপকরণ। যথা, শিলাখণ্ড, মৃৎপাত্র, চূনবালি নির্ম্মিত মূর্ত্তি, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি, খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের অষ্টধাতু নির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি, ধর্ম্মচক্র ইত্যাদি। এ ছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে লিপি সম্বলিত প্রচুর টেরাকোটা শীলমোহর। এই শীলমোহর-

গুলির মধ্যে আছে ব্যক্তিগত শীলমোহর, ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বৌদ্ধসূত্র সম্বলিত শীলমোহর এবং রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের শীলমোহর। বিহারের শীলমোহরে দুপাশে হরিণ ও মাঝে ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে এবং নীচে প্রাকৃত ভাষায় লেখা আছে—'শ্রী রক্তমৃত্তিকা মহাবৈহারিকা ভিক্ষুস্ম সঙ্ঘস্য' অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ভিক্ষু সঙ্ঘের। প্রধানতঃ রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের নাম উল্লেখিত একাধিক শীলমোহর প্রাপ্তি এবং বৌদ্ধবিহারের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টে এবং অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করে এ কথা বলা যায় যে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারটি এই রাঙামাটি অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে উৎখননকালে এই অঞ্চলে আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হবে এবং প্রাচীন বঙ্গের অনেক অজানা রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে॥